BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 11(16), 2015: 113-142
Copyright © BIIT
ISSN 1816-689X

Book Reviews

কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকারঃ একটি সার্বিক পর্যালোচনা, লেখকঃ মাওলানা সৈয়দ জিল্লুর রহমান, মোমতাজুল মোহাদ্দেসীন ও এম. এ. (চ. বি.), প্রকাশকঃ দারুল আনওয়ার, প্রকাশঃ জুন ২০১৪, মোট পৃষ্ঠাঃ ৮৮।

রিভিউ ও সংক্ষেপণঃ শাহ্ আব্দুল হান্নান, সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার, E-mail: shah_abdul_hannan@yahoo.com

অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারঃ মাওলা ও মাওয়ালী বনাম আছাবা

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারীগণ দু'প্রকার। যে সকল উত্তরাধিকারীর হিস্সা নির্ধারিত, তাদেরকে বলা হয় 'যবীল ফুরূজ'। যেমনঃ স্বামী, স্ত্রী, মাতা, মাতামহ প্রমুখ। আর যে সকল উত্তরাধিকারীর হিস্সা নির্ধারিত নয় বরং যারা 'যবীল ফুরূজ' উত্তরাধিকারীর অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণ সম্পদ এবং তাদের উপস্থিতিতে অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করেন, তাদেরকে বলা হয় 'মাওলা', উলামাগণ যাদেরকে অভিহিত করেন 'আছাবা' নামে। যেমনঃ পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি, পিতা-পিতামহ, ভাই-বোন প্রমুখ। আমরা অনির্ধারিত অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী লোকদেরকে এ 'মাওলা' নামে অভিহিত করতে চাই। কিন্তু উলামায়ে কেরাম তাদেরকে 'আছাবা' নামে অভিহিত করেন। আমাদের এ শব্দ চয়নের প্রধান কারণ হলো আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে এ নামে উত্তরাধিকারীদেরকে অভিহিত করেছেন। আর 'মাওলা' শব্দটি একটি ব্যাপক শব্দ, যা দিয়ে সকল অনির্ধারিত অবশিষ্টাংশভোগী হিস্সাদার উত্তরাধিকারীদেরকে শামিল করা যায়। তাছাড়া আল্লাহ যে নামে ওয়ারিসদেরকে চিহ্নিত করতে চান, সে নাম ব্যবহারের মধ্যে বরকত রয়েছে। তবে অন্যতম প্রধান কারণ হল এই যে, আমরা কন্যা সন্তানসহ নারীদেরকেও এ অনির্ধারিত অবশিষ্টাংশভোগী হিস্সাদার উত্তরাধিকারীর অন্তর্ভূক্ত করতে চাই। আমরা মনে করি, কন্যা সন্তানগণও মাওলা হতে পারেন। পক্ষান্তরে, আছাবা শব্দটি একটু কম শক্তিশালী শব্দ যা আত্মীয় নারীদেরকে ছাড়া অপরাপর মাওলাদেরকে শামিল করলেও অনাত্মীয় মাওলাদেরকে মোটেই শামিল করে না। এ কারণে ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা ও মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসকে বুঝাতে ঐ 'মাওলা' শব্দেই ফিরে যেতে হয়। 'আছাবা' পরিভাষার যারা সমর্থক ও ব্যবহারকারী, তারাও ক্রীতদাসের মুক্তিদাতাকে বুঝাতে 'মাওলাল আতাকা' এবং মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ বন্ধুকে বুঝাতে 'মাওলাল মাওয়ালাত' শব্দ প্রয়োগ করেন। এ কারণে বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব 'দুর্‌রুল মুখতার' গ্রন্থের লেখক মাওলার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেনঃ اَلْمُرَادُ بِالْمَوْلَى مَا يَعُمُّ الْمُعْتِقُ وَالْعَصَبَةُ মাওলা শব্দ দ্বারা ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা ও আছাবা উভয়কে বুঝায়।[১]

---

[১] আদ দুররুল মুখতার, ফাছলুন ফিল আছাবাত পৃ. ৭৭৬, ভ-৬; রাদ্দুল মুহ্তার ফী শারহে দুর্‌রিল মুখতার, ফাছলুন ফিল আছাবাত পৃ. ৪১১, ভ-২৯; আল লুবাব ফী শারহিল কিতাব, বাবুর রাদ্দ, পৃ. ৪২৩, ভ-১।

তাছাড়া আছাবা শব্দের এমন সব সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যেসব সংজ্ঞার সাথে আমরা একমত নই। উপরন্তু এ সকল সংজ্ঞাকে আমরা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে করি। সম্মানিত পাঠক সাধারণের সুবিধার্থে এখানে 'মাওলা' ও 'আছাবা' শব্দ দু'টির সবিস্তারে আলোচনা করা হল।

মাওলা ও মাওয়ালী

'মাওয়ালী' শব্দটি 'মাওলা' শব্দের বহুবচন। মাওলা শব্দের অর্থ হল সন্তান, পুত্র, চাচা, চাচাত ভাই, ভাগিনা, জামাই, অভিভাবক, উত্তরাধিকারী, আত্মীয়, স্বত্বাধিকারী, নেতা, সাহায্যকারী, ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা, মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস, মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ লোক, বন্ধু, প্রতিবেশী প্রভৃতি। কুরআন মজীদে 'মাওলা' শব্দটি ৯ (নয়) বার এবং 'মাওয়ালী' শব্দটি ২ (দুই) বার ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَأَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ

এটা এজন্য যে, আল্লাহ হলেন ইমানদার লোকদের 'মাওলা' বা সাহায্যকারী আর কাফের লোকদের জন্য কোনো 'মাওলা' বা সাহায্যকারী নেই (সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ১১)।

আল্লাহ আরো বলেন:

وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

আর তোমরা আল্লাহকে শক্তভাবে আকড়ে ধর। তিনিই হলেন তোমাদের 'মাওলা' বা মালিক। কতই না চমৎকার মালিক এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী (সুরা হাজ, ২২: ৭৮)।

আবার 'মাওয়ালী' শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ বলেন:

وَإِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِيْ وَكَانَتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا - يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ أَلِ يَعْقُوْبَ

আর আমার মৃত্যুর পরে আমার মাওয়ালীদের ব্যাপারে আমি শংকিত এবং আমার স্ত্রী হল বন্ধ্যা। সুতরাং আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একজন সন্তান দান কর; যে আমার ও ইয়াকুব বংশের উত্তরাধিকারী হবে (সুরা মারইয়াম, ১৯: ৫-৬)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا - وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ .

পুরুষদের জন্য হিস্সা রয়েছে যা তারা অর্জন করে এবং নারীদের জন্য হিস্সা রয়েছে যা তারা অর্জন করে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তার করুণা ভিক্ষা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেকটি বিষয়ে সকল

জ্ঞান রাখেন। এবং প্রত্যেককে আমরা মাওয়ালী বানিয়েছি পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা যা কিছু রেখে যান তাতে (সুরা নিসা, ৪: ৩২-৩৩)।

আয়াত দু'টির দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, 'মাওয়ালী' শব্দ দু'টিকে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, এ 'মাওয়ালী' উত্তরাধিকার সংক্রান্ত পরিভাষা। আর আল্লাহ তায়ালা 'মাওয়ালী' শব্দটি নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিলেন যে, নারী ও পুরুষের উভয়েই এ অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী বলে পরিগণিত হবে। এ জন্য ইমাম বাগাবী রাহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اَيْ: وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اَيْ عَصَبَةً يُعْطَوْنَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ

আল্লাহর বক্তব্য 'প্রত্যেককে আমরা মাওলা বানিয়েছি' অর্থাৎ পুরুষ নারী প্রত্যেককে আমরা মাওলা অর্থাৎ অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী বা আছাবা বানিয়েছি। পিতা-মাতা ও আত্মীয়গণ যা কিছু ছেড়ে যাবেন, তা থেকে তাদেরকে দেয়া হবে।[২]

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূথী রাহ.ও এ রকম ব্যাখ্যাই করেছেন। তবে ইবনু জারীর তাবারী রাহ. আরেকটু ব্যাপক ব্যাখ্যা করে বলেন:

فَتَاوِيْلُ الْكَلاَمِ وَلِكُلِّكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ جَعَلْنَا عَصَبَةً يَرِثُوْنَ بِهِ مِمَّا تَرَكَ وَالِدَاهُ وَاَقْرَبائُهُ مِنْ مِيْرَاثِهِمْ

বাক্যটির ব্যাখ্যা হল এই যে, হে লোকেরা, তোমাদের প্রত্যেককে আমরা অবশিষ্টাংশ ভোগী উত্তরাধিকারী বা আছাবা বানিয়েছি। তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা যা কিছু ছেড়ে যাবেন, তা থেকে তারা উত্তরাধিকারী হবে।[৩]

প্রখ্যাত মুফাস্সির ফখরুদ্দীন রাযী রাহ. তার বিখ্যাত তাফসির- 'তাফসিরে কাবীর' গ্রন্থে একটি হাদিসের উল্লেখ করে মাওয়ালীর অর্থ অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী বা 'আছাবা' বলে গ্রহণ করেছেন। বর্ণিত আছে:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ اَوْ ضَيَاعًا فَاَنَا وَلِيُّهُ فَلِاُدْعىَ لَهُ .

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুল সা. বলেছেন: মুমিনদের নিজেদের চেয়ে আমি বেশি হকদার। সুতরাং কেউ সম্পদ রেখে মারা গেলে সে সম্পদ তার মাওয়ালী অর্থাৎ অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী বা আছাবাদের জন্য। আর যে দেনা অথবা অভাবী সংসার রেখে মারা যাবে, তার অভিভাবক আমি। সে জন্য এ ব্যাপারে আমাকে যেন ডাকা হয়।[৪]

---

[২] তাফসিরুল বাগাবী, পৃ. ২০৫, ভ-২।

[৩] তাফসিরুত তাবারী, পৃ. ২৭২, ভ-৮।

[৪] বুখারি- ৬৩৬৪, বাবু ইবনায় আম্মিন আহাদুহুমা; বায়হাকী কুবরা- ১২১৫০, বাবুল আছাবা।

আছাবা

'আছাবা' শব্দটি আরবিতে اَلْعَصَبَةُ আকারে লিখা হয়, যার ধাতু হল عُصْبٌ উহা থেকে আসে اَلْعُصْبَةُ যার অর্থ হল 'দল', 'অধিক সংখ্যক', 'শক্তিশালী কয়েকজন' প্রভৃতি। কুরআন মজিদে 'আছাবা' শব্দটি নেই। শুধু ৩ (তিন) স্থানে এ عُصْبَةٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِذْ قَالُوْا لَيُوسُفُ وَأَخُوْهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِيْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ

যখন তারা বলল, ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয় অথচ আমরা কয়েকজন শক্তিশালী লোক। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা পরিষ্কার বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন (সুরা ইউসুফ, ১২: ৮)।

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন:

قَالُوْا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُوْنَ

তারা বলল, আমাদের মত একদল শক্তিশালী লোক থাকা সত্ত্বেও তাকে যদি নেকড়ে খেয়ে ফেলে, তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ব (সুরা ইউসুফ, ১২: ১৪)।

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরো বর্ণনা করেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

নিশ্চয়ই যারা অপবাদ ছড়িয়েছে, তারা তোমাদের অন্তর্ভূক্ত একটি দল। উহাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর না। বরং তোমাদের জন্য উহা কল্যাণকর (সুরা আন নূর, ২৪: ১১)। কিন্তু কোনো স্থানেই এ শব্দটিকে 'উত্তরাধিকারী' অর্থে ব্যবহার করা হয় নি।

এখানে عُصْبَةٌ শব্দ দ্বারা 'শক্তিশালী কয়েকজন লোক'- বুঝানো হয়েছে। অন্য দিকে اَلْعَصْبُ শব্দের অর্থ হল: শক্তি সঞ্চয় করার জন্য অন্যের সাহায্য নেয়া। এজন্য লতা জাতীয় উদ্ভিদ- যেগুলো অন্য উদ্ভিদের গা বেয়ে বেড়ে উঠে, সেগুলোকে বলা হয় اَلْعَصْبُ। আর اَلْعَصَبُ শব্দটির অর্থ হল:

اَطْنَابٌ مُنْتَشِرَةٌ فِى الْجِسْمِ كُلِّهِ وَبِهَا تَكُوْنُ الْحَرْكَةُ وَالْحِسُّ

'শিরা' যা সারা শরীরব্যাপী বিস্তৃত থাকে এবং যেগুলোর সাহায্যে নড়াচড়া করার ও অনুভব করার ক্ষমতা অর্জিত হয়'।[৫] اَلْعَصَبُ শব্দটি একটি বহুবচনের শব্দ। উহার এক বচন হল এই 'আছাবা' اَلْعَصَبَةُ শব্দটি।

ফারাইজবিদগণের দেয়া আছাবার সংজ্ঞা

ফারাইজবিদগণ অনির্ধারিত অবশিষ্টাংশভোগী হিস্সাদার উত্তরাধিকারী লোকদেরকে 'আছাবা' নাম দিয়েছেন। তারা যেভাবে আছাবার সংজ্ঞা দেন, তা নিচে আলোচনা করা হল:

[৫] আল মানজিদ, পৃ. ৫৩১।

শায়খ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল মুকাদ্দাসী রাহ. বলেন:

وَهُمْ كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلَي بِنَفْسِهِ اَوْ بِذَكَرٍ اَخَرَ

আছাবা সেই সকল পুরুষদেরকে বলা হয়, যারা মৃতের সাথে সরাসরি অথবা অন্য কোনো পুরুষ লোকের মাধ্যমে সম্পর্কিত।[৬]

শায়খ ইবরাহিম বিন আলী বিন ইউসুফ আশ্‌শীরাযী রাহ. বলেন:

اَلْعَصَبَةُ كُلُّ ذَكَرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ اُنْثَى

আছাবা সেই সকল পুরুষদেরকে বলা হয়, যাদের ও মৃতের মধ্যে কোনো নারীর অস্তিত্ব নেই।[৭]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ মাইয়্যারা রাহ. বলেন:

وَالْوَارِثُ بِالتَّعْصِيبِ إِنْ انْفَرَدَ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَوِي فَرْضٍ، أَخَذَ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.

আর আছাবা উত্তরাধিকারী যদি একা হয়, তবে সম্পূর্ণ সম্পদ নিয়ে নেয় আর যদি নির্ধারিত হিস্‌সাদার অপর কোনো উত্তরাধিকারীর সাথে অংশিদার হয়, তবে তাদেরকে দেয়ার পরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা সে গ্রহণ করে।[৮]

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন কুদামা রাহ. বলেন:

اَلْعَصَبَةُ هُوَ الْوَارِثُ بِغَيْرِ تَقْدِيْرٍ وَاِذَا كَانَ مَعَهُ ذُوْ فَرْضٍ اَخَذَ مَا فَضُلَ عَنْهُ قَلَّ اَوْ كَثُرَ وَاِنْ اِنْفَرَدَ اَخَذَ الْكُلَّ وَاِنْ اِسْتَغْرَقَتِ الْفُرُوْضُ الْمَالَ سَقَطَ

আছাবা হল এমন উত্তরাধিকারী যার নির্ধারিত কোনো হিস্‌সা নেই। তার সাথে যবীল ফুরূজ হিস্‌সাদার থাকলে তারা হিস্‌সা নেয়ার পরে অবশিষ্ট অংশ তিনি লাভ করেন, সম্পদের পরিমাণ অল্প হোক অথবা বেশি এবং তিনি একা হলে সমস্ত সম্পদের মালিক হন। আর যবীল ফুরূজগণ সমস্ত সম্পদ নিয়ে গেলে তিনি বঞ্চিত থাকেন।[৯]

আছাবার প্রকারভেদ

ফারাইজবিদগণ বলেন আছাবা তিন ধরণের। ১. স্বয়ংসম্পূর্ণ আছাবা বা আছাবা বিনাফসিহি, ২. অন্যের কারণে আছাবা বা আছাবা বিগায়রিহি এবং ৩. অন্যের সাথে আছাবা বা আছাবা মাআ গায়রিহি।

---

[৬] আল উমদাহ, বাবুল আছাবাত, পৃ. ৩১৩, ভ-১।

[৭] আল মুহায্‌যাব, পৃ. ২৯, ভ-২।

[৮] শারহু মাইয়্যারা, পৃ. ১২৫, ভ-৪।

[৯] আল মুগনী, পৃ. ৭, ভ-৭।

১. *আছাবা বিনাফসিহি:* আছাবা বিনাফসিহর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

اَمَّا الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ فَكُلُّ ذَكَرٍ لاَ تَدْخُلُ فِيْ نِسْبَتِهِ اِلَيَ الْمَيِّت اُنْثَي

স্বয়ংসম্পূর্ণ আছাবা হলো এমন পুরুষ উত্তরাধিকারী যার মৃতের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পথে কোনো নারী ঢুকে পড়ে নি।[১০]

যেমন: ছেলে, ছেলের তরফের নাতি বা আরো অধঃস্থন পুরুষ সন্তান, পিতা, দাদা বা আরো উর্দ্ধতন পূর্ব পুরুষ, চাচা, চাচার পুরুষ সন্তান, দাদার ভাই বা তাদের পুরুষ সন্তান ইত্যাদি। কারণ রসুল সা.-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

হজরত আব্দুল্লাহ বিন আবক্ষাস রা. থেকে বর্ণিত। রসুল সা. বলেছেন: সম্পদ হকদারদেরকে দিয়ে দাও। পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তা সর্বাধিক হকদার পুরুষ লোক পাবে।[১১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে (তাদের মতে):

اِقْسِمُوْا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا فَضُلَ فَلِذِىْ عَصَبَةٍ ذَكَرٍ

তোমরা সম্পদ নির্ধারিত হিস্সা অনুসারে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ কর। যা অবশিষ্ট থাকবে, তা পাবে পুরুষ আছাবাগণ।[১২]

২. *আছাবা বিগায়রিহি:* অন্যের কারণে আছাবা বা 'আছাবা বিগায়রিহি' হলেন এমন নারী, যাদের জন্য অর্ধেক বা দু'তৃতীয়াংশ হিস্সা নির্ধারিত আছে, তারা নিজেরা তো আছাবা নন কিন্তু তাদের সম-স্তরের ভ্রাতাগণ আছাবা হওয়ার কারণে ভাইদের সহযোগিতায় ও কল্যাণে তারাও আছাবার মর্যাদা লাভ করেন। যেমন: মেয়ে ও বোন। তারা তাদের সম-স্তরের ভাইদের অনুপস্থিতিতে অর্ধেক বা দু'তৃতীয়াংশ হিস্সা লাভ করেন। আর ভাইদের সাথে তারা বর্তমান থাকলে ভাইদের কল্যাণে তারাও আছাবা হয়ে অবশিষ্ট সম্পদে শরীক থাকেন। এ কারণে সকল আছাবার সমস্তরের বোনেরা ভাইদের কল্যাণে আছাবার মর্যাদা লাভ করতে পারেন না। কোনো বোনদের জন্য নির্ধারিত হিস্সা না থাকলে, তারা মৃতের সম্পদে কোনো হিস্সাই পান না। সে ধরণের বোনেরা ভাইদের সাথে থাকলেও তারা বঞ্চিত থাকেন। বলা হয়ে থাকে যে-

وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ لَيْسَ اَخَوَاتُهُمْ مِنْ اَهْلِ الْمِيْرَاثِ فَاِنَّهُنَّ لَسْنَ بِذَوَاتِ فَرْضٍ وَلاَيَرِثْنَ مُنْفَرِدَاتٍ فَلاَ يَرِثْنَ مَعَ اِخْوَتِهِنَّ شَيْئًا

---

[১০] সিরাজী, কানপুর প্রেস লক্ষ্ণৌ, পৃ. ৪২।

[১১] বুখারি- ৬৩৫১, বাবু মীরাছিল ওয়ালাদ মিন আবীহি; মুসলিম-৪২২৬, বাবু আলহিকুল ফারাইজা বিআহলিহা; তিরমিযী-২০৯৮, বাবুন ফী মীরাছিল আছাবা।

[১২] আল বাহরুর রায়ীক, পৃ. ৩৬৭, ভ-৮।

> আর বাকি সব আছাবাদের সমস্তরের বোনেরা উত্তরাধিকারী নন। কেননা তারা যবীল ফুরূজ নন এবং ভাইদের ছাড়া একাকী থাকলে তারা কোনো হিস্সা পান না। সেজন্য তারা তাদের ভাইদের সাথে থাকলেও কিছুই পাবে না।[১৩]

ছেলের তরফের নাতিনদের জন্যও কোনো নির্ধারিত হিস্সা নেই। কিন্তু নির্ধারিত হিস্সা না থাকলেও তাদেরকে এ 'আছাবা বিগাইরিহি' এর আওতায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। শুধুমাত্র হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি নাতি ও নাতিনের মধ্যে শুধু নাতিকে আছাবা গণ্য করেন, নাতিনকে নাতির উপস্থিতিতেও 'আছাবা বিগাইরিহি' গণ্য করেন না। যেমন- বর্ণিত হয়েছে:

> عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: فِيْ رَجُلٍ تَرَكَ اِبْنَتَيْهِ وَبَنِيْ اِبْنِهِ رِجَالاً وَنِسَاءً: فَلِاِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُوْرِ دُوْنَ الْإِنَاثِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَزِيْدُ الْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُوْنَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
>
> হজরত ইবরাহিম রাহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: কোনো লোক যদি দু'জন মেয়ে ও ছেলের তরফের কয়েকজন নাতি-নাতিন রেখে মারা যায়, তবে তার দু'মেয়ে পাবে দু'তৃতীয়াংশ আর যা কিছু বাকি থাকবে, তা পাবে নাতিগণ; নাতিনেরা কিছুই পাবে না। আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. মেয়ে ও বোনদেরকে দু'তৃতীয়াংশের বেশি কিছুই দিতেন না। আর হজরত আলী ও যায়েদ রা. নাতি-নাতিন উভয়কে পরস্পরের শরীক রাখতেন। সুতরাং যা কিছু বাকি থাকত, তাতে তারা 'এক পুরুষ দুই নারীর সমান হিস্সা পাবে- এ নীতিমালা অনুসারে প্রদান করতেন।[১৪]

৩. *আছাবা মাআ গায়রিহি:* অন্যের সাথে আছাবা বা 'আছাবা মাআ গায়রিহি' হলেন এমন নারী যারা নিজেরা আছাবা নন কিন্তু অন্য নারী-আত্মীয়ের সঙ্গে থাকার কারণে তারা আছাবা হয়ে অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করেন। যেমন: বোন। বোন নারী হওয়ার কারণে আছাবা নন; কিন্তু কন্যাদের সাথে বোন থাকলে কন্যা ঠিকই যবীল ফুরূজ থাকেন কিন্তু বোন আছাবা হয়ে যান। এ কারণে কন্যাদের সাথে বোন থাকলে, এ মতের প্রবক্তাগণ, বোনদেরকে আছাবা বানিয়ে অবশিষ্ট সম্পদ দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাদের দলিলগুলো নীচে আলোচনা করা হল-

ক. হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর হাদিস:

> عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ هُذَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيْلَ قَالَ سُئِلَ اَبُوْ مُوْسَى عَنْ اِبْنَةٍ وَاِبْنَةِ اِبْنٍ وَاُخْتٍ فَقَالَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَيُتَابِعُنِيْ فَسُئِلَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ وَاُخْبِرَ بِقَوْلِ اَبِيْ مُوْسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ اِذَنْ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ أَقْضِيْ فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[১৩] আল মুগনী, পৃ. ১৬, ভ-৭; সিরাজী, পৃ. ৪৬।

[১৪] আবনু আবী শাইবা- ৩১৭৪৩, ফী রাজুলিন তারাকা ইবনাতাইহি ও বনী ইবনিহি।

لِلاِبْنَةِ اَلنِّصْفُ وَلِاِبْنَةِ الْاِبْنِ اَلسُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ فَأَتَيْنَا اَبَامُوْسَي فَاَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لاَ تَسْأَلُوْنِيْ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيْكُمْ .

হজরত আবু কায়েস রাহ. বলেন: আমি হুযাইল বিন শুরাহবীল রাহ.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হজরত আবু মূসা আশআরী রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, যদি একজন মেয়ে, একজন ছেলের তরফের নাতিন ও একজন বোন থাকে, তাহলে কে কত হিস্সা করে পাবে? তখন তিনি বললেন: মেয়ে অর্ধাংশ পাবে আর বাকিটুকু পাবে বোন। তুমি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ-এর কাছে গিয়ে দেখতে পার, তিনিও আমার অনুসরণ করবেন। হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-কে জিজ্ঞাসা করলে এবং আবু মুসা রা.-এর মতামতের কথা জানালে তিনি বললেন: আমি সঠিক পথের দিশা না পেলে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। আমি এমন রায় দেব যে রকম রায় দিয়েছিলেন রসুল সা.। মেয়ে অর্ধাংশ পাবে, নাতিন পাবে এক ষষ্ঠাংশ যাতে করে দু'জনের হিস্সা মোট দু'তৃতীয়াংশ হয়। আর বাকিটুকু পাবে বোন। আমরা হজরত আবু মূসা আশআরী রা.-এর কাছে ফেরত গিয়ে তার কাছে ইবনু মাসউদ রা.-এর রায়ের কথা জানালে তিনি বললেন, এ পণ্ডিত যতদিন আছে, ততদিন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর না।[১৫]

খ. রসুল সা. আরো বলেন (এ মতের প্রবক্তাদের মতানুসারে):

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِجْعَلُوا اْلاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

কেননা রসুল সা. বলেছেন: 'তোমরা কন্যাদের সাথে বোনদেরকে আছাবা বানাও'।[১৬]

সমালোচনা ও পর্যালোচনা

পর্যালোচনা করার শুরুতে আমরা 'আছাবা' শব্দটির আরেকটু ব্যাখ্যা করতে চাই। প্রচলিত অর্থে আছাবা শব্দটি বলতে বুঝায়: قَوْمُ الرَّجُلِ الَّذِيْنَ يَتَعَصَّبُوْنَ لَهُ 'মানুষের স্বগোত্রীয় লোক, যারা ন্যায়-অন্যায় বিচার বিবেচনা না করেই তার পক্ষপাতিত্ব করে'। কারণ اَلتَّعَصُّبُ হল:- عَدَمُ قَبُوْلِ الْحَقِّ عِنْدَ ظُهُوْرِالدَّلِيْلِ بِنَاءً عَلَيْ مَيْلٍ اِلَي جَانِبٍ অর্থাৎ اَلتَّعَصُّبُ বলতে দলিল প্রমাণ পাওয়ার পরেও পক্ষপাতিত্বের কারণে সত্যকে গ্রহণ না করা বুঝায়। এ শব্দ থেকেই কর্তাবাচক শব্দ হল اَلْعَصَبِيُّ যার অর্থ হল:

اَلَّذِىْ يُعِيْنُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ وَيَغْضِبُ لِعُصْبَتِهِ وَيُحَامِىُ عَنْهُمْ

[১৫] বুখারি- ৬৩৫৫, কিতাবুল ফারাইজ বাবু মীরাছী ইবনাতি ইবনিন মাআ ইবনাতিন; তিরমিযী- ২০৯৩ কিতাবুল ফারাইজ, বাবু মীরাছী ইবনাতিল ইবনি মাআ ইবনাতিছ ছুলব; আবু দাউদ- ২৮৯২, বাবু মা জাআ ফী মীরাছিছ ছুলব; ইবনু মাজাহ- ২৭২১, কিতাবুল ফারাইজ; আল মুসতাদরাক- ৭৯৫৮, কিতাবুল ফারাইজ; মুসনাদু আহমাদ- ৩৬৯১, পৃ. ২১৮, ভ-৬।

[১৬] সিরাজী, পৃ. ৩১ (কানপুর প্রেস লক্ষ্ণৌ); আল বাহরুর রায়ীক, পৃ. ৫৬৬, ভ-৮; তাবয়ীনুল হাকায়িক, বাবুল খুলয়ি, পৃ. ২৩৬, ভ-৬; মাজমাউল আনহর ফী শারহে মুলতাকাল আবহর, পৃ. ৫০৬, ভ-৪; আল মাওসূআতুল ফেকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ, আহওয়ালুল আব, পৃ. ৪০, ভ-৩; ফেকহুস সুন্নাহ, পৃ. ৬১৯, ভ-৩।

এমন ব্যক্তি যে গোত্রীয় অন্যায়ে সাহায্য করে, তাদের দল ভারি করার জন্য অযথাই রেগে যায় এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দান করে। পক্ষান্তরে اَلْعَصَبِيَّةُ (আছবিয়্যাত) হল নিজ গোত্রের লোকদের সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের গভীরতা ও তাদেরকে সাহায্যের চেষ্টা।[১৭]

রসুল সা.-এর হাদিসেও আছাবাগিরী বলতে এ কথাকেই বুঝানো হয়েছে। বর্ণিত আছে:

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ قَالَ اَنْ تُعِيْنَ قَوْمَكَ عَلَيْ الظُّلْمِ

হজরত ওয়াছেলা বিন আছকা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি বললাম- হে রসুল সা, আছাবিয়্যাত কি? তিনি বললেন: অন্যায় করার ব্যাপারে তুমি তোমার গোত্রকে সাহায্য করলে তা আছবিয়্যাত।[১৮]

সুতরাং বলা যায় যে, কারো আছাবা বলতে তার 'গোত্রীয় অন্ধ সমর্থক জ্ঞাতি'দেরকে বুঝানো হয়। এ গোত্রপ্রীতি জাহেলিয়াতের জামানায় খুব প্রবল ছিল। যুগের পর যুগ, শতাব্দির পর শতাব্দি এ গোত্রীয় শত্রুতার কারণে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আছাবা হল: আইয়্যামে জাহেলিয়াতের শক্তিমত্তা, গোত্রপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, যুদ্ধের উন্মত্ততা, নিজ লোকদের অন্যায়ে প্রশ্রয়দান প্রভৃতি দুষ্কর্মকারী পুরুষ আত্মীয়গণের নাম। ইসলাম পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায়নীতির পয়গাম নিয়ে আগমন করেছে। এ কারণে ইসলাম পূর্ব আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সকল জঞ্জাল সাফ করার উদ্দেশ্যেই আছবিয়্যাতের এ সকল ধারণার বিরোধিতা করা হয়েছে। আর একই কারণে আমরা আছাবা পরিভাষা পরিহার করে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত পরিভাষা 'মাওলা' ব্যবহার করেছি। রসুল সা. অবশ্য প্রথমদিকে আছাবাদের উত্তরাধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ও সম্পদের উত্তরাধিকার শুধুমাত্র আছাবাদের প্রাপ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا اَحْرَزَ الْوَلَدُ اَوِالْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ.

হজরত উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল সা.-কে এরশাদ করতে আমি শুনেছি, তিনি বলেছেন: সন্তান অথবা পিতা-মাতা যে সম্পদ সঞ্চয় করে যাবেন তা আছাবাদের মধ্যে যারা থাকবেন, তারাই পাবেন।[১৯]

এ হাদিস থেকে জানা যায় যে, আছাবা ছাড়া অন্য কেউ উত্তরাধিকারী হয়ে কোনো সম্পদের অধিকারী হতে পারেন না। ফারাইজের আইন নাযিল হওয়ার আগে রীতি ও পদ্ধতি এ রকমই ছিল। কিন্তু অচিরেই রসুল সা.-এর নির্দেশনা আছাবাদের বিপরীতে কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে। এজন্য পরবর্তিতে তিনি আছাবাগিরীকে অনৈসলামিক ও অনৈতিক বলে ঘোষণা করেন। বর্ণিত আছে:

---

[১৭] আল মানজিদ, পৃ. ৫৩১।

[১৮] আবু দাউদ- ৫১২১, বাবুন ফিল আছাবিয়্যাহ; বায়হাকী কুবরা- ২০৮৬৫, বাবু শাহাদাতি আহলিল আছাবিয়্যাহ; আল মু'জামুল কাবীর তাবারাণী- ১৯৭, মিন ইসমিহি ওয়াছেলা।

[১৯] আবু দাউদ- ২৯১৯, বাবুন ফিল ওয়ালা; ইবনু মাজাহ- ২৭৩২, বাবুন ফী মীরাছিল ওয়ালা; মুসনাদু আহমাদ-১৮৩, পৃ. ৩১৪, ভ-১; মুছান্নাফু ইবনি আবী শাইবা- ৩২১৭১, ফী ইমরাআতিন আ'তাকাত মামলূকান।

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَي اِلَي عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَي عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَي عَصَبِيَّةٍ

হজরত যুবায়ের বিন মুত্ইম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুল সা. বলেছেন: যে আছবিয়্যাতের দিকে আহ্বান করে সে আমার উম্মাতের মধ্যে শামিল নয়। আর যে আছবিয়্যাতের কারণে যুদ্ধ করে, সে আমার উম্মাতের মধ্যে শামিল নয় এবং যে আছবিয়্যাতের জন্য নিহত হয় সেও আমার উম্মাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।[২০]

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আছাবা, আছবিয়্যাত প্রভৃতি ইসলামপূর্ব সময়ের পরিভাষা। ইসলাম সে পরিভাষাকে পরিবর্তন করেছে। গোত্রীয় পক্ষপাতের স্থলে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ স্থান লাভ করেছে।

আছাবা পরিভাষা সংক্রান্ত মতবাদের প্রবক্তাদের নির্ধারিত আছাবার এ সংজ্ঞা ১ নম্বর আছাবাদেরকে শামিল করলেও ২ ও ৩ নম্বর আছাবাদেরকে শামিল করে না। কারণ ২ ও ৩ নম্বর আছাবাগণ নিজেরা নারী। আর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- 'আছাবা সেই সকল পুরুষদেরকে বলা হয়, যারা মৃতের সাথে সরাসরি অথবা অন্য কোনো পুরুষ লোকের মাধ্যমে সম্পর্কিত'। এ সংজ্ঞা মোতাবেক কোনো নারী কোনো ভাবেই আছাবা হতে পারে না। দ্বিতীয়ত: নারীরা যদি সমস্তরের পুরুষের সহযোগিতায় আছাবা হয়, তাহলে ফুফু বা ভাতিঝিগণ চাচা ও ভাতিজার সাথে আছাবা হবে না কেন? যদি বলা হয় যে, তাদের জন্য হিস্সা নির্ধারিত নেই এ কারণে তারা আছাবা হতে পারবে না, তাহলে তো বলতে হবে যে, তাদের সম-স্তরের পুরুষ লোকদেরও তো হিস্সা নির্ধারিত নেই, এমনকি তারা অনির্ধারিত হিস্সা পাবেন বলেও কোথাও উল্লেখ নেই। সুতরাং তারা আছাবা হবে কোন যুক্তিতে? উপরন্তু ছেলের তরফের নাতিনদেরও কোনো হিস্সা নির্ধারিত নেই, সুতরাং তারাও আছাবা হবে কেন? তৃতীয়ত: যে কন্যা নিজে নারী হওয়ার কারণে আছাবা নয়, সে কেমন করে অন্য আরেক নারী অর্থাৎ বোনকে আছাবা বানাবে, অথচ নিজে আছাবা হতে পারবে না?

আছাবা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ থিওরী হল এই যে, কোনো নারীর সন্তানগণ তাদের নিজ মাতার আছাবা-উত্তরাধিকারী হওয়ার স্বীকৃতিটুকুও পাবেন না। কারণ নারীর আছাবা-উত্তরাধিকারী হলেন তার পৈত্রিক নিবাসের পুরুষ আত্মীয়গণ। বেদায়া ও নেহায়া কিতাবের লেখক ইবনু রুশ্দ রাহ. বলেন: لِاَنَّ إِبْنَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ مِنْ عَصَبَتِهَا 'কারণ কোনো নারীর পুত্র তার আছাবার অন্তর্ভুক্ত নয়'। এ জন্য দাস মুক্তির কারণে 'মাওলাল আতাকা' হওয়ার অধিকার নারীর পুত্র পাবে না বরং তার পৈত্রিক নিবাসের পিতা, ভাই, চাচাতো ভাইগণ লাভ করবে।[২১] *সুতরাং বুঝা গেল যে, আছাবা সংক্রান্ত মতবাদের সম্পূর্ণটাই মানব রচিত ও কল্পনা প্রসূত মনগড়া যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ। আল্লাহ তায়ালা এ রকম কোনো বিধান নাযিল করেন নি।*

তাদের উল্লেখিত দলিলাদির ব্যাপারে একটু নজর করলে দেখতে পাবেন যে, প্রথম হাদিসটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণবিহীন একটি 'মুজমাল' হাদিস। নিশ্চয়ই রসুল সা. ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া 'মুজমাল' কিছু বলেন নি। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

---

[২০] আবু দাউদ- ৫১২৩, বাবুন ফিল আছাবিয়্যাহ; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, পৃ. ৩৪০, ভ-৬।

[২১] আল বেদায়াতুল মুজতাহিদ ও নেহায়াতুল মুকতাছিদ, পৃ. ৩৬৫, ভ-২।

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُوْنَ.

> তিনি হুকুমের পরে আয়াতের ব্যাখ্যা বলে দেন, যাতে করে তোমাদের প্রভুর সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা শক্ত বিশ্বাস হাসিল করতে পার (সুরা আর রাদ, ১৩: ২)।

বরং আলোচ্য হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা হল এই যে, এ হাদিসের মাধ্যমে রসুল সা. পুত্রকে বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ হাদিসে বলা হয়েছে لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ বা 'সর্বাধিক হকদার পুরুষ' পাবে অবশিষ্ট অংশ। আর ছেলেই হল সর্বাধিক হকদার পুরুষ উত্তরাধিকারী। পিতা কিংবা ভাই-এর ক্ষেত্রে এ হাদিস প্রযোজ্য নয়, কারণ তারা কেউই সর্বাধিক হকদার নন। পিতার হিস্সা তো কুরআন দ্বারা নির্ধারিত রয়েছে। সন্তান থাকলে পিতা এক ষষ্ঠাংশ পান আর সন্তান না থাকলে তিনি অবশিষ্ট অংশ লাভ করেন। ভাইও সন্তান এবং পিতা না থাকা অবস্থায় অবশিষ্ট অংশ লাভ করেন। অথচ ছেলের কোনো হিস্সা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা হল- "একজন ছেলে দু'জন মেয়ের সমান হিস্সা পাবে"। যা একটু অস্পষ্ট বটে যা রসুল সা.-এর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যামূলক হাদিসের শব্দকে পুঁজি করে আছাবার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের থিওরী দাড় করানো গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া উল্লেখিত একটি খবরে ওয়াহিদ যাকে ইমাম তাহাবী রাহ. সনদের দিক থেকে 'মুজতারাব' হাদিস বলে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয় যে হাদিসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা কোন হাদিসের কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। রসুল সা. এ রকম কিছু বলেছেন কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। 'আল বাহরুর রায়িক' সহ কিছু কিতাবে উহাকে হাদিস বলে দাবি করা হয়েছে কিন্তু আমরা কোনো কিতাবে উহাকে খুঁজে পাই নি। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং কথা হল এই যে, আল বাহরুর রায়ীক কিতাবের ৮ম ভলিউমের ৩৬৭ পৃষ্ঠার নিচে লিখিত টিকায় উহার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এভাবে- 'উহাকে বুখারি বর্ণনা করেছেন কিতাবুল ফারাইজের ৫, ৭, ৯ ও ১৫ নম্বর অধ্যায়ে; মুসলিম বর্ণনা করেছেন কিতাবুল ফারাইজের ২ ও ৩ নম্বর হাদিস হিসেবে এবং দারিমী বর্ণনা করেছেন কিতাবুল ফারাইজের ২৮ নম্বর অধ্যায়ে'। কিন্তু আমরা সংশ্লিষ্ট কিতাবের নির্দিষ্ট হাদিস কিংবা অধ্যায়ে উহার কোনো অস্থিত্ব খোঁজে পাই নি। যা পেয়েছি তা হল: لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ 'সর্বাধিক হকদার পুরুষ লোক' কথাটি। সেখানে فَلِذِىْ عَصَبَةٍ ذَكَرٍ 'পুরুষ আছাবাগণ পাবে' বলে কোনো বক্তব্য নেই। রসুল সা.-এর বক্তব্য বিকৃত করার উহা একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রসুল সা. বললেন لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ আর তারা উহাকে বিকৃত করে فَلِذِىْ عَصَبَةٍ ذَكَرٍ বলে রূপান্তরিত করে নিলেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কুরআন-হাদিসকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার তাওফীক দিন।

'আছাবা বিগাইরিহি' সংক্রান্ত আলোচনায় বলা হয়েছে যে, وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ لَيْسَ اَخَوَاتُهُمْ مِنْ اَهْلِ الْمِيْرَاثِ ...'আর বাকি সব আছাবাদের সমস্তরের বোনেরা উত্তরাধিকারী নন...'। এ বক্তব্যটি একটি নব্য-জাহেলিয়াতি বক্তব্য। কারণ অন্ধকার যুগে নারীদেরকে উত্তরাধিকারী গণ্য করা হত না। এ ধরণের বক্তব্য সরাসরি কুরআন বিরোধী। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَإِنْ كَانُوْا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

> আর যদি তারা (উত্তরাধিকারীগণ) পুরুষ-নারীতে মিশ্রিত কয়েকজন ভাই-বোন হয়, তাহলে একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিস্সা পাবে (সুরা নিসা, ৪: ১৭৬)।

এ ধরণের বক্তব্যের বিরোধীতা করে হজরত যায়েদ বিন ছাবিত রা. বলেন:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِيْهَا هَذا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَرِثُ الرِّجَالُ دُوْنَ النِّسَاءِ

হজরত যায়েদ বিন ছাবিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি এ রকম ব্যাপারে বলেন: এ ধরণের রায় জাহেলী জামানার লোকদের রায়ের অন্তর্ভুক্ত- তারা পুরুষদেরকে উত্তরাধিকারী গণ্য করত, নারীদেরকে নয়।[২২]

সুতরাং বুঝা গেল যে, ইসলাম বিরোধী ও জাহেলী ভাবধারাযুক্ত চিন্তাধারা আছাবা থিওরীর মাধ্যমে ইসলামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সাহাবায়ে কেরাম সে ধরনের থিওরীর সাথে একমত ছিলেন না।

'আছাবা মাআ গাইরিহি' সংক্রান্ত আলোচনায় উদ্ধৃত তাদের দ্বিতীয় হাদিসখানা সরাসরি রসুল সা.-এর কোনো হাদিস নয়। উহা হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর একটি রায় মাত্র। তিনি শুধু এ দাবি করেছেন যে, এ রকম একটি রায় রসুল সা. দিয়েছিলেন। কিন্তু কখন তিনি এ রায় দিয়েছিলেন, কুরআনের আয়াত নাযিলের আগে না পরে- তা তিনি বলেন নি। আর কুরআনের হুকুমের বিপরীতে এ রকম কান রায় রসুল সা. দিতে পারেন না। তাছাড়া অন্য একটি হাদিস থেকেও জানা যায় যে, কন্যার উপস্থিতিতে ভাই-বোন কোনো হিস্সা পান না। বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَيَ الْمَوْتِ فَاَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ لِيْ مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ اِبْنَتِيْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ فَقَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَّةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ.

হজরত আমির বিন সা'দ বিন আবী ওকাছ রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: 'আমি মক্কায় এমন অসুস্থ হয়ে পড়লাম যে আমি মৃত্যুর আশংকা করছিলাম। রসুল সা. আমাকে দেখতে আসলেন। আমি তাঁকে জিঙ্গাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রসুল, আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। আর একজনমাত্র কন্যা ছাড়া আমার অপর কেউ উত্তরাধিকারী হওয়ার নেই; আমি কি দু'তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করতে পারি? তিনি বললেন: 'না', আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন: 'না', আমি বললাম, তাহলে এক তৃতীয়াংশ, তিনি বললেন: 'এক তৃতীয়াংশই তো বেশি। তোমার সন্তানকে সম্পদশালী রেখে যাওয়া অধিক উত্তম তাদেরকে এমন অভাবগ্রস্থ রেখে যাওয়ার চেয়ে যে তারা অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়াবে।[২৩]

উল্লেখ্য যে, যখন হজরত সা'দ বিন আবী ওকাছ রা. এ মন্তব্য করেন, তখন তার ভাই-বোন, ভ্রাতষ্পুত্রগণ ও অন্যান্য জ্ঞাতিগণ জীবিত ছিলেন। কথিত আছাবাগণ কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে উত্তরাধিকারী গণ্য হলে রসুল

---

[২২] ইবনু আবী শাইবা- ৩১৭২৭, রাজুলুন মাতা ও তারাকা উখতাইহি; দারিমী- ২৮৯২, বাবুল ইখওয়াতি ওয়াল আখাওয়াতি ওয়াল ওয়ালাদ; আল ইসতিযকার, পৃ. ৩৩৬, ভ-৫; আল মুহাল্লী, পৃ. ২৭০, ভ-৯; ইবনু আবী শাইবা- ৩১৭২৭, রাজুলুন মাতা ও তারাকা উখতাইহি; দারিমী- ২৮৯২, বাবুল ইখওয়াতি ওয়াল আখাওয়াতি ওয়াল ওয়ালাদ; আল ইসতিযকার, পৃ. ৩৩৬, ভ-৫; আল মুহাল্লী, পৃ. ২৭০, ভ-৯।

[২৩] বুখারি- ৬৩৫২, বাবু মীরালি বানাত; মুসলিম- ৪২৯৬, বাবুল ওয়াছিয়্যাতি বিছ ছুলুছ; আবু দাউদ- ২৮৬৬, বাবু মা জাআ ফী মালা ইয়াজুযু; ইবনু মাজাহ- ২৭০৮, বাবুল ওয়াছিয়্যাতি বিছ ছুলুছ; তিরমিযী- ২১১৬, আল ওয়াছিয়্যাতু বিছ ছুলুছ; নাসায়ি- ৩৬৩২, পৃ. ৫৫৩, ভ-৬; মুসনাদু আহমাদ- ১৪৪০, পৃ. ৫০, ভ-৩; মুয়াত্তা মালিক- ২৮২৪, আল ওয়াছিয়্যাতু ফিছ ছুলুছ।

সা. তখন নিশ্চয়ই বলতেন: 'কেন তোমার তো ভাই-বোন, ভ্রাতষ্পুত্রগণ ও অন্যান্য জ্ঞাতিগণ রয়েছেন?' কারণ রসুল সা.-এর নিজ গোত্র কুরাইশ বংশের এ লোকেরা তার আত্মীয় এবং পূর্বপরিচিত ছিলেন। এখন আমরা আলোচনা করে দেখাব যে, তখন তার কোনো কোনো আত্মীয় জীবিত ছিলেন।

'আমির' নামে হজরত সা'দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর একজন ভাই ছিলেন বলে জানা যায়। বর্ণিত আছে:

وَهُوَ عَامِرٌ بْنُ أَبِيْ وَقَاصٍ وَاِسْمُ أَبِيْ وَقَاصٍ مَالِكٌ أَسْلَمَ بَعْدَ عَشَرَةِ رِجَالٍ وَهُوَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبْشَةِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْهَا أَخُوْهُ سَعْدٌ.

তিনি হলেন আমির বিন আবী ওকাছ রা.। আর আবু ওকাছের নাম ছিল মালিক। তিনি দশজন পুরুষলোক ইসলাম গ্রহণের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি কিন্তু তার ভাই হজরত সা'দ ওখানে হিজরত করেন নি।[২৪]

এ সাহাবি উমর রা.-এর খেলাফতকালে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন। উল্লেখ আছে:

وَقَالَ الْبَلَاذُرِيْ هَاجَرَ عَامِرٌ اَلْهِجْرَةَ الثَّانِيَةِ إِلَى الْحَبْشَةِ وَقَدِمَ مَعَ جَعْفَرَ وَمَاتَ بِالشَّامِ فِيْ خِلَافَةِ عُمَرَ.

আর আল্লামা বালাজুরী রাহ. বলেন, 'আমির' দ্বিতীয় দলের সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং 'জা'ফর' রা.-এর সাথে (মদিনায়) প্রত্যাবর্তন করেন। আর উমর রা.-এর খেলাফতকালে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন।[২৫]

হজরত সা'দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর 'আতেকা' নাম্নি একজন বোন ছিলেন বলে জানা যায়। বর্ণিত আছে:

حَدَّثَتْنِيْ عَاتِكَةُ بِنْتُ أَبِيْ وَقَاصٍ أُخْتُ سَعْدٍ قَالَتْ جِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ فِيْ ثَمَانِ نِسْوَةٍ وَمَعِيَ اِبْنَايَ فَقُلْتُ هَذَانِ اِبْنَا عَمِّكَ وَاِبْنَا خَالَتِكَ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا عَمْرَو بْنَ عُتْبَةِ بْنِ نَوْفَلَ وَكَانَ اَصْغَرَهُمَا فَوَضَعَهُ فِيْ حِجْرِهِ

সা'দ রা.-এর বোন 'আতেকা' বিনতু আবী ওকাছ রা. হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসুল সা. মক্কায় প্রবেশের পরে আমি আটজন নারীর সঙ্গে তার কাছে আমার দু'জন পুত্রকে নিয়ে এসে বললাম, এ দু'জন আপনার চাচার দু'পুত্র আর আপনার দু'খালাত ভাই। তখন তিনি তাদের একজন আমর বিন উতবা বিন নাওফালকে ধরে তার কোলে বসালেন। আর সে ছিল দু'জনের মধ্যে কনিষ্ঠ।[২৬]

হজরত সা'দ রা.-এর আরেকজন বোন ছিলেন বলে জানা যায় যার নাম ছিল 'সাকীনা'। বর্ণিত আছে:

---

[২৪] উসদুল গাবাহ, পৃ. ৫৬৫, ভ-১।

[২৫] আল ইছাবা ফী তাময়ীযিছ সাহাবা, পৃ. ৫৯৮, ভ-৩।

[২৬] আল ইছাবা ফী তাময়ীযিছ সাহাবা, পৃ. ৬৮, ভ-৫।

عَنْ أُمِّ الْحِكَمِ سَكِيْنَةِ بِنْتِ أَبِيْ وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْجِهَادَ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ، فَمَا جِهَادُنَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﷺ جِهَادُكُنَّ الْحَجُ.

আবু ওকাছের কন্যা উম্মুল হিকাম সাকীনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল সা. জিহাদের আলোচনা করলে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসুল, আমাদের জিহাদ কোনটি?' তখন রসুল সা. বললেন, 'তোমাদের জিহাদ হল হাজ্জ করা'।[২৭]

ইতিহাস থেকে হজরত সা'দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর দু'জন ভ্রাতষ্পুত্রেরও পরিচয়ও পাওয়া যায়। যেমন: বর্ণিত হয়েছে-

نَافِعٌ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ اَلزُّهْرِيْ وَهُوَ اِبْنُ أَخِيْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ وَهُوَ أَخُوْ هَاشِمٍ الْمِرْقَالِ لَهُ صُحْبَةٌ وَأَبُوْهُ عُتْبَةُ هُوَ الَّذِيْ كَسَرَ رُبَاعِيَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَمَاتَ عُتْبَةُ كَافِرًا قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَوْصَى إِلَى أَخِيْهِ سَعْدٍ ثُمَّ أَسْلَمَ نَافِعٌ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ .

যুহরী উপগোত্রের নাফে' বিন উতবা বিন আবী ওকাছ রা.। তিনি সা'দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর ভ্রাতষ্পুত্র ছিলেন। তিনি হাশিম আল মিরকালের ভাই ছিলেন। তিনি রসুল সা.-এর সান্যিধ্য লাভে ধন্য ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে রসুল সা.-এর সামনের চার দাত ভাঙ্গার অপকর্মকারী উতবা ছিল তার পিতা। আর উতবা মক্কা বিজয়ের পূর্বে তার ভাই সা'দ রা.-এর নিকট ওছিয়াত করে মৃত্যু বরণ করে। অতঃপর এই নাফে' রা. মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عُمَرَ قَالَ: وَ أَمَّا هَاشِمُ الْأَعْوَرُ فَإِنَّهُ اِبْنُ عُتْبَةَ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ: أَسْلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَ كَانَ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ وَ هُوَ اِبْنُ أَخِيْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ شَهِدَ صِفِّيْنَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ كَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الرَّجَّالَةِ

মুহাম্মাদ বিন উমর রা. বলেন, এক চোখ অন্ধ হাশিম ছিলেন উতবা বিন আবী ওকাছ-এর পুত্র। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এক চোখ কানা; ইয়ারমূকের যুদ্ধে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি ছিলেন সা'দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর ভ্রাতষ্পুত্র। তিনি হজরত আলী বিন আবী তালিব রা.-এর সাথে ছিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেন। সেদিন তিনি পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন।[২৯]

অপর একটি বর্ণনা মোতাবেক জানা যায় যে, হজরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. তার গোত্রের অন্তর্ভূক্ত তার জ্ঞাতি ভাই ছিলেন। বর্ণিত হয়েছে:

---

[২৭] আখবারু মাক্কা লিল ফাকেহী- ৭৫৫, পৃ. ৩৪৫, ভ-২; মারেফাতুছ সাহাবা - ৭০৬৬, পৃ. ২৭০, ভ-২৩; আল ইছাবা ফী তাময়ীযিছ সাহাবা -১১২৯৮, পৃ. ৭০২, ভ-৭; উসদুল গাবাহ, পৃ. ১৩৬৫, ভ-১।

[২৮] উসদুল গাবাহ, পৃ. ১০৫৮, ভ-১।

[২৯] আল মুসতাদাকু আলাছ ছাহীহাইন হা. নম্বর: ৫৬৯৩, পৃ. ৪৪৭, ভ-৩।

عَنْ عُرْوَةَ فِيْمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِىْ زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِىْ وَقَّاصِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ.

হজরত উরওয়া রাহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'বনী যুহরা বিন কেলাব বিন মুররা'- গোত্রের অন্তর্ভূক্ত যে কয়জন লোক রসুল সা.-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন- আব্দুর রহমান বিন আওফ বিন আব্দে আওফ বিন হারিছ বিন যুহরা রা. এবং সা'দ বিন আবী ওকাছ বিন ওহাব বিন আব্দে মনাফ বিন যুহরা রা.।[৩০]

এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হজরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. হজরত সা'দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর জ্ঞাতি ভাই ছিলেন। তার দাদার দাদা যিনি ছিলেন তার নাম ছিল যুহরা এবং আব্দুর রহমান বিন আওফ রা.-এর দাদার দাদাও ছিলেন একই যুহরা। যদি আছাবাদের কোনো হিস্সা থাকত, তাহলে এ আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. আছাবা হিসেবে উত্তরাধিকার পেতেন। তখন হজরত সা'দ বিন আবী ওকাছ রা. একথা বলতেন না যে, وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ اِبْنَتِيْ "আর একজন মাত্র কন্যা ছাড়া আমার অপর কোনো উত্তরাধিকারী হওয়ার নেই" আর তিনি বললেও রসুল সা. প্রতিবাদ করতেন। কিন্তু বাস্তবে কেউই একথাটি বলেন নি।

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, গোষ্ঠির পুরুষ জ্ঞাতিগণকে আছাবা বানিয়ে মতবাদ সৃষ্টি ও কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই-বোন ও অপরাপর আছাবাগণকে উত্তরাধিকারী গণ্য করার কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই। উহা সম্পূর্ণই মানুষের কল্পনা-প্রসূত মতবাদ, মানব রচিত মতবাদ; রসুল সা.-এর প্রিয় সাহাবি হজরত যায়েদ বিন ছাবিত রা.-এর মতে উহা জাহেলী মতবাদ; আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত কোনো বিধান নয়, কুরআন-হাদিস ভিত্তিক কোনো বিধান নয়।

ফারাইজবিদগণ তৃতীয় যে হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা কোনো হাদিস নয়। উহা একটি বানোয়াট ও জাল বিষয়। রসুল সা. এ রকম কিছু বলেন নি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বানোয়াট ও মাওযূ বিষয় দ্বারা ইলমুল ফারাইজের থিওরী দাড় করানো হয়েছে। ফতোয়ায়ে শামী কিতাবের লেখক দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, উহা কোনো হাদিস নয়, ফারাইজবিদদের কারো উক্তি মাত্র। তিনি বলেন:

لِقَوْلِ الْفَرْضِيِّيْنَ اِجْعَلُوْا اْلاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً جَعَلَهُ فِي السِّرَاجِيَّةِ وَغَيْرِهَا حَدِيْثًا قَالَ فِي سَكَبِ الْاَنْهَرِ وَلَمْ اَقِفْ عَلَى مَن خَرَّجَهُ

অর্থাৎ 'ফারাইজবিদদের কারো নিজস্ব বক্তব্য اِجْعَلُوْا اْلاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً বাক্যাংশ মোতাবেক। এ বাক্যাংশটিকে সিরাজীসহ কোনো কোনো লেখক 'হাদিস' বলে উল্লেখ করেছেন। 'সাকাবুল আনহার' নামক কিতাবের লেখক বলেন: 'এ বক্তব্যটিকে হাদিস বলে কোন মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেছেন তা আমি অবগত নই' (অর্থাৎ আমি খুঁজে পাইনি)।[৩১] মিশরীয় লেখক ড. রফীক ইউনুস ও তার 'ইলমুল ফারাইজ ওয়াল মাওয়ারীছ' নামক কিতাবে উহাকে ফারাইজবিদদের কারো নিজস্ব বক্তব্য বলে উল্লেখ করে বলেছেন:

---

[৩০] বায়হাকী কুবরা- ১৩৪৭০, বাবু ই'তায়িল ফাইয়ি আলাদ দিওয়ান।

[৩১] রাদ্দুল মুহ্তার, ফাছলুন ফিল আছাবাত পৃ. ৪১২, ভ-২৯; হাশিয়াতু ইবনি আবিদীন, পৃ. ৭৭৬, ভ-৬; রাদ্দুল মুহ্তার, ফাছলুন ফিল আছাবাত, পৃ. ৪১২, ভ- ২৯; হাশিয়াতু ইবনি আবিদীন, পৃ. ৭৭৬, ভ-৬।

اِجْعَلُوا اْلاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً لَيْسَ دَلِيْلاً شَرْعِيًّا بَلْ هُوَ مِنْ كَلاَمِ الْفَرْضِيِّيْنَ.

অর্থাৎ 'اِجْعَلُوا اْلاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً' বাক্যাংশটি শরিয়তের কোনো দলিল নয় বরং উহা ইলমুল ফারাইজে পারদর্শী কোনো পণ্ডিতের ব্যক্তিগত উক্তি মাত্র'।[৩২] সুতরাং প্রমাণিত হল যে, 'আছাবা বিনাফসিহি, আছাবা বিগাইরিহি ও আছাবা মাআ গায়রিহি' সংক্রান্ত থিওরী সঠিক নয়। বোন নিজে স্বনির্ভর 'মাওলা'। আরেকজনের কাধে ভর করে তাকে মাওলা হতে হবে না। মেয়েও নিজে মাওলা। তাকেও আরেকজনের কাধে ভর করে মাওলা হতে হবে না। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন:

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.

> যদি কোনো নিঃসন্তান লোক তার কোনো বোনকে রেখে মারা যায়, তাহলে সে বোন ঐ ব্যক্তি যা কিছু রেখে যাবে তার অর্ধেক পাবে। ভাইও তার মৃত বোনের উত্তরাধিকারী হবে, যদি বোনের কোনো সন্তান না থাকে (সুরা নিসা, ৪: ১৭৬)।

মেয়ে নিজে আছাবা হওয়ার কারণে তার উপস্থিতিতে ভাই-বোন হিস্সা পাবেন না বলে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে ঘোষণা করলেন। আছাবার প্রবক্তাগণ এ আয়াতের এক আজব ব্যাখ্যা দান করেন। তারা বলেন- 'যেহেতু কন্যা সন্তান একা সব সম্পদ পায় না, তাই ভাই কিংবা বোন কন্যা সন্তানের সাথে হিস্সা পাবে। আর আয়াতে সন্তান বলতে 'পুত্র সন্তান' বুঝানো হয়েছে'। বড়ই আশ্চর্যের কথা। কুরআনে ১৪ বার এ 'ওয়ালাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সকল স্থানে ব্যবহৃত 'ওয়ালাদ' অর্থ সন্তান, শুধু সুরা নিসার ১৭৬ নম্বর আয়াতে ব্যবহৃত 'ওয়ালাদ' শব্দের অর্থ 'পুত্র' (?) কত সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা, কত স্বার্থবাদী বিশ্লেষণ! এবারে আসুন আমরা 'ওয়ালাদ' শব্দের বিশ্লেষণ করি।

'ওয়ালাদ' শব্দের বিশ্লেষণ ও বিশদ ব্যাখ্যা

وَلَدَ, يَلِدُ, وِلاَدَةً ক্রিয়াপদ দ্বারা প্রসব করা বা জন্ম দেয়া বুঝায়। প্রসবের ফলশ্রুতিতে জন্মদানের মাধ্যমে যে সন্তানের জন্ম হয়, তাকে 'ওয়ালাদ' বলা হয়। তাই উহা থেকেই সৃষ্টি হয় اَلْوَلَدُ নামপদ, যার অর্থ হল সন্তান বা শিশু। আর জন্মদাতাকে বলা হয় اَلْوَالِدُ বা পিতা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ - اَللهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ

> বল হে নবি, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ স্বনির্ভর। তিনি কাউকে জন্ম দেন না। আর তার জন্মও হয় নি (সুরা ইখলাছ, ১১২: ১-৩)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا اِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا

> নিশ্চয়ই আপনি যদি ওদেরকে জীবিত রাখেন, তাহলে তারা আপনার অপরাপর গোলামদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং ওরা অপরাধী নাস্তিক ছাড়া কাউকে জন্মও দিবে না (সুরা নূহ, ৭১: ২৬)।

---

[৩২] ইলমুল ফারাইজ ওয়াল মাওয়ারীছ, পৃ. ৪৩।

এজন্য 'ওয়ালাদ' শব্দ দ্বারা লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে সন্তান বুঝায়। সে সন্তান পুত্র সন্তানও হতে পারে, আবার কন্যা সন্তান ও হতে পারে। এমনকি কারো সন্তান হিজড়া বা উভয়লিঙ্গ হলে তাকেও 'ওয়ালাদ' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়। সন্তানের লিঙ্গ পরিচয়সহ বুঝানোর জন্য ওয়ালাদ শব্দের পরে লিঙ্গ বাচক বিশেষণ বসাতে হয়। তাই পুত্র সন্তানের আরবি হল اَلْوَلَدُ الذَّكَرُ আর কন্যা সন্তানের আরবি হল اَلْوَلَدُ اْلأُنْثَىْ পক্ষান্তরে, হিজড়া বা উভয়লিঙ্গ সন্তানের আরবি হল اَلْوَلَدُ الْخُنْثَىْ। আল্লাহ তায়ালা ওয়ালাদ শব্দের বহুবচনে 'আওলাদ' শব্দ ব্যবহার করে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন পুরুষ ও নারী বলে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلأُنْثَيَيْنِ

> তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিস্সা পাবে (সুরা নিসা, ৪: ১১)।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হিস্সা বলার পাশাপাশি আওলাদ শব্দের ব্যাখ্যাও বলে দিয়েছেন। রসুল সা.ও ওয়ালাদ শব্দের মাধ্যমে কন্যা সন্তানকে বুঝিয়েছেন বলে হাদিস থেকে জানা যায়। হজরত সা'দ বিন আবু ওকাছ রা. যখন রসুল সা.-কে জিজ্ঞাসা করে বললেন: 'আমার তো একজন মাত্র কন্যা সন্তান রয়েছে। আমি কি দু'তৃতীয়াংশ সম্পদ ছাদাকা করতে পারি?' তখন রসুল সা. উত্তরে বললেন:

اِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَّةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

> তোমার সন্তানকে বিত্তশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া অধিক কল্যাণকর, তাদেরকে লোকদের কাছে ভিক্ষা করে বেড়ানোর মত বিত্তহীন অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে'।[৩৩]

এ হাদিসে ওয়ালাদ শব্দের দ্বারা কন্যা সন্তানকে যে বুঝানো হয়েছে- তা তো স্পষ্ট। কারণ প্রশ্নকারী সাহাবি তো বলেই দিয়েছেন যে, আমার একমাত্র কন্যা উত্তরাধিকারী রয়েছে; কোনো পুত্র সন্তান নেই। আরবের লোকেরাও ওয়ালাদ শব্দ দ্বারা কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তান উভয়কে বুঝত এবং এ মর্ম বুঝাতে ওয়ালাদ শব্দ প্রয়োগও করত। হজরত আওস বিন ছামিত রা. সংক্রান্ত হাদিসে আমরা দেখেছি যে, সুয়াইদ ও আরফিজা নামীয় তার দু'জন চাচাত ভাই রসুল সা.-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন:

فَقَالاَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَلَدُهَا لاَ يَرْكَبُ فَرَسًا وَلاَ يَحْمِلُ كَلاًّ وَلاَ يَنْكَأُ عَدُوًّا

> হে রসুল সা. তার (আওসের স্ত্রীর) সন্তান ঘোড়ায় চড়তে পারে না ও ভার বহন করতে পারে না এবং শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে না।[৩৪]

এখানে তারা আওস রা.-এর কন্যাদেরকে বুঝাতে ওয়ালাদ শব্দের ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া কুরআনের ভাষাতত্ত্ব নিয়ে যেসব উলামাগণ চিন্তা গবেষণা করেন, তারাও 'ওয়ালাদ' শব্দটি 'সন্তান' বা 'নবজাতক' বুঝায় বলে মনে করেন। যেমন:

---

[৩৩] বুখারি- ৬৩৫২, বাবু মীরালি বানাত; মুসলিম- ৪২৯৬, বাবুল ওয়াছিয়্যাতি বিছ ছুলুছ; আবু দাউদ-২৮৬৬, বাবু মা জাআ ফী মালা ইয়াজুযু; ইবনু মাজাহ- ২৭০৮, বাবুল ওয়াছিয়্যাতি বিছ ছুলুছ; তিরমিযী- ২১১৬, আল ওয়াছিয়্যাতু বিছ ছুলুছ; নাসায়ি- ৩৬৩২, পৃ. ৫৫৩, ভ-৬; মুসনাদু আহমাদ- ১৪৪০, পৃ. ৫০, ভ-৩; মুয়াত্তা মালিক- ২৮২৪, আল ওয়াছিয়্যাতু ফিছ ছুলুছ।

[৩৪] তাফসিরুল বাগাবী, পৃ. ১৪৯, ভ-৪।

১. আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী বলেন:

اَلْوَلَدُ اَلْمَوْلُوْدُ يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ قَالَ اللهُ تَعَالَي (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ) وَ (اَنَّي يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ) وَيُقَالُ لِلْمُتَبَنِّي وَلَدٌ، قَالَ: (أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا) وَقَالَ: (وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: اَلْوَلَدُ اَلْإِبْنُ وَالْإِبْنَةُ وَالْوَلَدُ هُمُ الْاَهْلُ وَالْوَلَدُ.

'ওয়ালাদ' অর্থাৎ 'নবজাতক' বা 'ভূমিষ্ঠ শিশু'। একবচন, বহুবচন, ছোট, বড় সবার ক্ষেত্রেই ওয়ালাদ বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ -'আর যদি কোনো শিশু (সন্তান) না থাকে'। এবং اَنَّي يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ -'কোথা থেকে তার শিশু (সন্তান) হবে'। আর পালকপুত্রকেও ওয়ালাদ বলা হয়। তিনি বলেন: أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا 'অথবা আমরা তাকে সন্তান বানিয়ে নেব'। তিনি আরোও বলেন: وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ 'আর শপথ জন্মদাতার ও যা কিছু সে জন্ম দিয়েছে'। আবুল হাসান বলেন: ওয়ালাদ হল পুত্র ও কন্যা এবং ওয়ালাদ হল পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদি।[৩৫]

২. তাফসিরে হাক্কীতে এ 'ওয়ালাদ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে:

وَالْوَلَدُ اَلْمَوْلُوْدُ وَيُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى

আর ওয়ালাদ হল নবজাতক, আর সেটা এক ও অনেক, ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সবার ক্ষেত্রেই বলা যায়[৩৬]।

৩. তাফসিরে ইনে আব্বাসে বলা হয়েছে 'ওয়ালাদ' অর্থ পুত্র ও কন্যা। যেমন:

{وَهُوَ يَرِثُهَآ} إِنْ مَاتَتْ {إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ} ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى

(আর ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে) যদি সে বোন মারা যায় {যদি তার কোনো সন্তান না থাকে} পুত্র ও কন্যা।[৩৭]

৪. তাফসিরে রুহুল বায়ানে বলা হয়েছে:

وَالْوَلَدُ اَلْمَوْلُوْدُ وَيُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى

আর ওয়ালাদ হল নবজাতক, আর সেটা এক ও অনেক, ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সবার ক্ষেত্রেই বলা যায়।[৩৮]

৫. বিশ্ববিখ্যাত অভিধানগ্রন্থ আল মু'জামুল ওয়াসীথ এ বলা হয়েছে:

(اَلْوَلَدُ) كُلُّ مَا وُلِدَ (وَيُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ) (ج) أَوْلَادٌ وَوَلَدَةٌ وَالرَّهْطُ .

---

[৩৫] আল মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ৫৪৮।

[৩৬] তাফসিরে হাক্কী, পৃ. ১৮৬, ভ-৯।

[৩৭] তানবীরুল মিকবাস ফী তাফসিরি ইবনি আব্বাস, পৃ. ১১২, ভ-১।

[৩৮] তাফসিরে রুহুল বায়ান, পৃ. ১৩৭, ভ-৬।

'ওয়ালাদ' হল যা কিছু ভূমিষ্ট হয়। আর উহা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ এবং দ্বিবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। এর বহুবচন হল 'আওলাদ' ও 'ওলদাহ' এবং 'রাহথ'।[৩৯]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে, 'ওয়ালাদ' শব্দের মধ্যমে ভূমিষ্ঠ শিশুকে বুঝায়। সেজন্য 'ওয়ালাদ' শব্দের মাধ্যমে শিশুপুত্র, শিশুকন্যা বা লিঙ্গহীন অথবা হিজড়া সকল শিশুকে বুঝাবে।

কিছু কিছু হাদিস থেকে জানা যায় যে, রসুল সা. একজন কন্যাকে সম্পদের অর্ধেক দিয়ে বাকি অর্ধেক অন্যকে দিয়েছেন। এ ধরনের হাদিসের ভিত্তিতেও তারা দাবি করেন যে, অন্যকে যেহেতু দিয়েছেন, তাই বোন 'আছাবা মাআ গায়রিহি' হবে। কিন্তু এ রকম হাদিস থেকে সন্তানের উপস্থিতিতে ভাইবোনের হিস্সা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারণ রসুল সা. ফারাইজের প্রাথমিক যুগে ভাই-বোনকে দিয়েছেন। তাও বোনকে বা ভাইকে দিয়েছেন এরকম নয়। ভাতিজাকে দিয়েছেন, মুক্তিদাতা মুনিবকে দিয়েছেন এমনকি মুক্তিপ্রাপ্ত সাবেক ক্রীতদাসকে দিয়েছেন বলেও বর্ণিত আছে। রসুল সা. যখন এ সকল লোককে দিয়েছেন তখনও নারীদেরকে মাওলার মর্যাদা দান করে সুরা নিসার ৩৩ নম্বর আয়াত নাযিল হয়নি। উপরোক্ত সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই-বোন পাবেন না বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে বিদায় হজের সময়ে। বুখারি ও মুসলিম শরীফে এসেছে:

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْ الْكَلاَلَةِ

হজরত বারা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: 'সর্বশেষ কুরআনের যে আয়াত নাযিল হয় তা হল- يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْ الْكَلاَلَةِ - অর্থাৎ সুরা নিসার এই ১৭৬ নম্বর আয়াত'।[৪০]

অন্য হাদিসে এসেছে:

عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ نُزِلَتْ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ وَالنَّبِيُّ فِيْ مَسِيْرٍ لَهُ وَاِلَي جَنْبِهِ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَبَلَغَهَا النَّبِيُّ حُذَيْفَةَ وَبَلَغَهَا حُذَيْفَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطاَّبِ وَهُوَ يَسِيْرُ خَلْفَهُ فَلَمَّا اِسْتَخْلَفَ عُمَرُ سَأَلَ عَنْهَا حُذَيْفَةُ وَرَجَأَ اَنْ يَكُوْنَ عِنْدَهُ تَفْسِيْرُهَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ وَاللهِ اِنَّكَ لَعَاجِزٌ اِنْ ظَنَنْتُ اَنَّ اِمَارَتَكَ تَحْمِلُنِيْ اَنْ اُحَدِّثَكَ فِيْهَا بِمَا لَمْ اُحَدِّثْكَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ عُمَرُ لَمْ اَرُدَّ هَذَا رَحِمَكَ اللهُ.

মোহাম্মদ বিন সীরিন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কালালা সংক্রান্ত আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন নবি সা. সফরে ছিলেন। তার পাশে ছিলেন হজরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রা.। আয়াত নাযিলের পর রসুল সা. তা হজরত হুযাইফা রা.-এর কাছে পৌঁছে দেন আর তিনি তা হজরত উমর রা.-এর কাছে পৌঁছে দেন, যিনি তার পিছু পিছু চলছিলেন। হজরত উমর রা. যখন খলিফা হলেন, তখন তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন আশা করে হুযাইফা রা. তাকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন (কিন্তু ব্যাখ্যা না পেয়ে)। তাকে বললেন: 'আমি তো দেখছি তোমার শাসন আমাকে বাধ্য করবে তোমাকে কিছু কথা বলতে, যা আমি তখন বলিনি'। তখন হজরত উমর রা. বললেন: 'আমি এ কথার জবাব দেব না। আল্লাহ তায়ালা আপনার মঙ্গল করুন'।[৪১]

---

[৩৯] আল মু'জামুল ওয়াসীথ, পৃ. ১০৫৬, ভ-২।

[৪০] মুসলিম- ৪২৩৭, বাবু আখিরু আয়াতিন উনযিলাত; বুখারি- ৪৩৭৭, কিতাবুত তাফসির।

[৪১] তাফসিরুত তাবারী- ১০৮৭৪, পৃ. ৪৩৫, ভ-৯; তাফসিরুত তাবারী- ১০৮৭৪, পৃ. ৪৩৫, ভ-৯।

তাছাড়া এ কথাতো খুবই সর্বজন প্রসিদ্ধ কথা যে, কুরআনের নির্দেশনা থাকলে হাদিস দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত আসবে না। কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করে হাদিসকে বহাল রাখা যায়, কিন্তু হাদিস মানতে গিয়ে কুরআনকে পরিত্যাগ করা যায় না। বরং হাদিসকে বাদ দিয়ে কুরআনের ওপর আমল করতে হয়। আছাবা সংক্রান্ত ব্যাপারেও এ নীতি কার্যকর করতে হবে।

কন্যার অধিকার ও প্রাপ্য

কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানের মতই পিতা-মাতার বংশধারার রক্ষক। আল্লাহ তায়ালা কন্যার গর্ভজাত সন্তানের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নবি সা.-এর বংশধারা রক্ষা করেছেন। মৃতের সবচেয়ে অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী হল তার ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনি। কন্যার অবস্থা পাঁচটি।

প্রথমত : মৃতের একমাত্র সন্তান হিসাবে যদি একজন মাত্র কন্যা থাকে ও অন্য কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে সে কন্যা অন্য অংশীদার না থাকার কারণে সমগ্র সম্পদ লাভ করবে।

দ্বিতীয়ত : অন্য উত্তরাধিকারীদের সাথে মৃতের একমাত্র সন্তান হিসেবে যদি একজন কন্যা সন্তান বর্তমান থাকে, তাহলে অন্য উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের নির্ধারিত হিস্সা দেয়ার পরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে সে অবশিষ্ট অংশের অর্ধাংশ উক্ত কন্যা সন্তান লাভ করবে।

তৃতীয়ত : মৃতের যদি একাধিক কন্যা থাকে ও অন্য কোনো উত্তরাধিকারী না থাকেন, তাহলে কন্যাগণ মৃতের সমস্ত সম্পদ লাভ করবে। যেমন: কোনো ছেলে থাকলে সে সমস্ত সম্পদ লাভ করে।

চতুর্থত : অন্য উত্তরাধিকারীর সাথে একাধিক কন্যা সন্তান বর্তমান থাকলে, তারা অন্য অংশীদারদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত হিস্সা দেয়ার পরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তার সবটুকু লাভ করবে।

আর পঞ্চমত : যদি মৃতের সন্তান কয়েকজন ছেলে-মেয়ে হয় এবং অপর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে সমগ্র সম্পদ তাদের মধ্যে বন্টিত হবে। সেক্ষেত্রে সূত্র হবে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ - 'একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিস্সা পাবে'। আর অন্য উত্তরাধিকারী থাকলে সে উত্তরাধিকারীগণ তাদের নির্ধারিত হিস্সা নেয়ার পরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, মৃতের সন্তানগণ উপরোক্ত সূত্র মোতাবেক সে অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করবে।

এখানে আমরা কেবল কন্যা সন্তান থাকলে এবং অন্য উত্তরাধিকারী না থাকার অবস্থা বিশ্লেষণ করব।

কন্যা একমাত্র উত্তরাধিকারী

মানুষ তার জীবন কালে সন্তান সন্ততি হাসিল করে ও সম্পদ অর্জন করে। কিন্তু মানুষের কাছে সর্বদাই সম্পদের চেয়ে সন্তানের মূল্য সর্বাধিক। এজন্য সন্তানের কল্যাণ চিন্তা করে মানুষ সম্পদ খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় না। সন্তান যদি পুত্র হয়, তাহলে সে পুত্রের মাধ্যমে মানুষ তার বংশধারা রক্ষা করে। প্রাক ইসলামি যুগে মানুষ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে একটু কম আগ্রহী ছিল। এজন্য তখন কন্যা সন্তানগণ সম্পদে অংশীদারিত্ব পেত না। আর সংগত কারণেই পুত্র না থাকলে মানুষ সম্পদ রেখে যেতে চাইত না। কিন্তু ইসলাম এসে মানুষের সে ধারণা পাল্টে দিল। হজরত সা'দ বিন আবু ওকাস রা.-এর প্রশ্নের উত্তরে রসুল সা. এরশাদ করলেন:

اِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَّةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

তোমার সন্তানকে সম্পদশালী রেখে যাওয়া অধিক উত্তম তাদেরকে এমন অভাবগ্রস্থ রেখে যাওয়ার চেয়ে যে তারা অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়াবে।[৪২]

তাই ইমানদারগণ তাদের ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সন্তানদের জন্য সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করতে চান। এজন্য মানুষ মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত হালাল সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। অপরদিকে জন্মলগ্ন থেকেই সন্তানগণ তাদের পিতা-মাতার অর্থনৈতিক দায়িত্বশীলতার অধীনে থেকে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। সন্তানের অর্থনৈতিক দায়িত্বশীল হলেন তাদের পিতা-মাতা। পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করলে সে সন্তানেরা যাতে অর্থনৈতিক দূরাবস্থার মধ্যে পতিত না হয়, সে জন্য আল্লাহ তায়ালা মৃত পিতা-মাতার সম্পদ সন্তানদের জন্য বরাদ্ধ দিয়েছেন। সন্তান ছেলে হোক অথবা মেয়ে হোক, তার প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতা-মাতার। আর সে কারণেই পিতা-মাতা মারা গেলে সম্পদের উত্তরাধিকারও সে ছেলে-মেয়েদেরই প্রাপ্য। তাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তিও পিতা-মাতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ওপর নির্ভর করে।

এ কারণে সন্তানদের জন্য কোনো অংশ উল্লেখ না করেই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

يُوصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনা হল- একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিস্সা পাবে (সুরা নিসা, ৪: ১১)।

এখানে আয়াতের প্রথমাংশের দিকে তাকালে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সমস্ত সম্পদ সন্তানদের জন্য। সেখানে সম্পদ শুধু ছেলে সন্তানদের জন্য একথা বলা হয় নি। বরং বলা হয়েছে যে, সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে সম্পদের বন্টন পদ্ধতি হবে- 'একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিস্সা পাবে'-এ সূত্র মতে। 'সিয়াকে কালাম' বা বক্তব্যের ধরন দেখে বুঝা যায় যে, 'একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিস্সা হিসেবে' সন্তানেরা সমস্ত সম্পদ পাবে। আর এ সূত্র মতে একজন মাত্র পুত্র থাকলে সে সম্পূর্ণ সম্পদের মালিক হবে আবার শুধুমাত্র একজন কন্যা থাকলে সেও সম্পূর্ণ সম্পদের মালিকানা লাভ করবে। কেননা উত্তরাধিকারী না থাকার কারণে সম্পদ বন্টনের প্রয়োজন নেই। একাধিক বৈধ ও যোগ্য উত্তরাধিকারী বর্তমান থাকলেই কেবল সম্পদ বন্টনের প্রয়োজন। যদি কোনো লোক মারা যায় তার একজন অমুসলিম পুত্র ও একজন মুসলিম কন্যা রেখে, তখন সে কন্যা একা সমস্ত সম্পদের মালিকানা হাসিল করবে। অমুসলিম হওয়ার কারণে ছেলে কিছুই পাবে না। কারণ রসুল সা. বলেছেন:

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

কোনো মুসলিম তার কোনো অমুসলিম আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হবে না এবং কোনো অমুসলিম তার কোনো মুসলিম আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হবে না।[৪৩]

---

[৪২] বুখারি- ৬৩৫২, বাবু মীরালি বানাত; মুসলিম- ৪২৯৬, বাবুল ওয়াছিয়্যাতি বিছ ছুলুছ; আবু দাউদ- ২৮৬৬, বাবু মা জাআ ফী মালা ইয়াজুযু; ইবনু মাজাহ- ২৭০৮, বাবুল ওয়াছিয়্যাতি বিছ ছুলুছ; তিরমিযী- ২১১৬, আল ওয়াছিয়্যাতু বিছ ছুলুছ; নাসায়ি- ৩৬৩২, পৃ. ৫৫৩, ভ-৬; মুসনাদু আহমাদ- ১৪৪০, পৃ. ৫০, ভ-৩; মুয়াত্তা মালিক- ২৮২৪, আল ওয়াছিয়্যাতু ফিছ ছুলুছ।

আবার যদি কোনো লোক তার একজন মেয়ে ও একজন ভাই রেখে মারা যায়, তাহলেও মেয়েটি সমস্ত সম্পদ একা লাভ করবে; ভাই কিছুই পাবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَهُوَ يَرِثُهَآ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

এবং ভাই তার মৃত বোনের উত্তরাধিকারী হবে, তবে শর্ত হল বোনটি নিঃসন্তান হতে হবে (সুরা নিসা, ৪: ১৭৬)।

এ আয়াতে সন্তান না থাকা ভাই-এর উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য শর্ত করা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা নিজে সন্তানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায় -

يُوصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনা হল- একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিস্সা পাবে (সুরা নিসা, ৪: ১১)।

এ আয়াতে সন্তানের আওতায় ছেলে ও মেয়ের কথা বলে আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়ে দিলেন যে, সন্তান বলতে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই বুঝায়। একমাত্র উত্তরাধিকারী একজন মাত্র কন্যা সন্তান হলে তার হিস্সা সমগ্র সম্পদ না আংশিক সম্পদ, তা নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। হজরত উমর, আলী, উসমান, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-সহ অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে একমাত্র উত্তরাধিকারী একজন মাত্র কন্যা হলে সে সমস্ত সম্পদ লাভ করবে। কিন্তু হজরত যায়েদ বিন ছাবিত রা.-সহ কিছু উলামায়ে কেরামের মতে একমাত্র কন্যাসন্তান অর্ধেক সম্পদ লাভ করবে। আর বাকি অর্ধেক লাভ করবে রাষ্ট্রীয় তহবিল বা 'বাইতুল মাল'। বাইতুল মাল না থাকলে কিংবা কোনো অমুসলিম দেশে মৃত্যু বরণ করলে কি হবে, তা অবশ্য তারা বলেন নি।

শুধুমাত্র একাধিক কন্যাসন্তান উত্তরাধিকারী হলে, তাদের অবস্থা

যদি মৃতের উত্তরাধিকারী কয়েকজন কন্যা সন্তানই হন এবং অপর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকেন, তাহলে সে কন্যাসন্তানগুলো মৃতের সকল সম্পদের মালিকানা লাভ করবে।

কারণ আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ-

একজন ছেলে পাবে দু'জন মেয়ের সমান হিস্সা (সুরা নিসা, ৪: ১১)।

এ কথাটুকুকে উল্টিয়ে চিন্তা করলে পাওয়া যায় যে, দু'জন মেয়ে পাবে একজন ছেলের সমান হিস্সা। একজন ছেলে যেহেতু অন্য উত্তরাধিকারী না থাকলে সমস্ত সম্পদের হকদার হয়, ঠিক তেমনি অন্য উত্তরাধিকারী না থাকলে দু'জন মেয়েও সমস্ত সম্পদের হকদার হবে। আল্লাহ তায়ালা আরোও এরশাদ করেন:

---

[৪৩] মুসলিম- ৪২২৫, বাবু ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া; বুখারি- ৬৩৮৩, বাবু লা ইয়ারিছুল মুসলিমু; তিরমিযী- ২৭১১, ইবতালুল মীরাছি বইনাল মুসলিম; আবু দাউদ- ২৯১১, বাবু হাল ইয়ারিছুল মুসলিমুল কাফির; ইবনু মাজাহ- ২৭২৯, বাবু মীরাছি আহলিল ইসলামমুসলিম- ৪২২৫, বাবু ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া; বুখারি- ৬৩৮৩, বাবু লা ইয়ারিছুল মুসলিমু; তিরমিযী- ২৭১১, ইবতালুল মীরাছি বইনাল মুসলিম; আবু দাউদ- ২৯১১, বাবু হাল ইয়ারিছুল মুসলিমুল কাফির; ইবনু মাজাহ- ২৭২৯, বাবু মীরাছি আহলিল ইসলাম।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ

আমরা (পুরুষ ও নারীর) প্রত্যেককে পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা যা কিছু রেখে যাবেন তাতে মাওলা বানিয়েছি (সুরা নিসা, ৪: ৩৩)।

এ আয়াতে যেহেতু নারীকেও আল্লাহ তায়ালা মাওলা বা আছাবার মর্যাদা দিয়েছেন, সে জন্য একাধিক মেয়েও আছাবা হয়ে সমস্ত সম্পদের মালিকানা হাসিল করবে।

কন্যা সন্তান নিছক যবীল ফুরূজের অন্তর্ভুক্ত উত্তরাধিকারী বলে যারা মনে করেন, তারা দু'জন কন্যার হিস্সার ব্যাপারেও ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মতে কন্যা সন্তান একজন হলে মোট সম্পদের অর্ধেক পায়, একাধিক হলে দু'তৃতীয়াংশ পায় এবং তাদের সাথে ছেলে সন্তানও থাকলে একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমান হিস্সা হিসেবে অতিরিক্ত অংশে অংশীদার হয়। একাধিক কন্যা সন্তান যে দু'তৃতীয়াংশ পায়, তার প্রমাণ হিসেবে তারা সুরা নিসার ১২ নম্বর আয়াতকে পেশ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

সুতরাং যদি তারা দু'এর অধিক কন্যা সন্তান হয়, তবে তারা দু'তৃতীয়াংশ পাবে সে যা কিছু ছেড়ে যাবে, তা থেকে (সুরা নিসা, ৪: ১২)।

পক্ষান্তরে, হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর মতবাদ বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, মেয়ে ও বোনেরা মাওলার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তারা তাদের সম-স্তরের ছেলে ও ভাইদের সাথে একত্রে থাকলেও মাওলা একা থাকলেও মাওলা বলে বিবেচিত হবেন। এ কারণে তারা মোট সম্পদ লাভ করতে পারেন। এ মতবাদের স্বপক্ষে দলিল হল নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

একজন পুত্র সন্তানের হিস্সা হবে দু'জন কন্যা সন্তানের হিস্সার সমান (সুরা নিসা, ৪: ১১)।

এ আয়াতাংশ থেকে জানা যায় যে, একজন ছেলে ঠিক ততটুকু পাবে, দু'জন মেয়ে যতটুকু পাবে। এখন দু'জন মেয়ে সমস্ত সম্পদ লাভ করতে না পারলে একজন ছেলেও কোনো ভাবেই সমস্ত সম্পদের অধিকারী হতে পারবে না। এখানে এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে ছেলে মেয়ে মিশ্রিত অবস্থায় থাকলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে, অন্যথায় নয়। কারণ মিশ্রিত অবস্থায় থাকার কোনো শর্ত কুরআনের আয়াতে বর্তমান নেই।

২. আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

আর আমরা (পুরুষ ও নারীর) প্রত্যেককে পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা যা কিছু রেখে যাবেন তাতে মাওলা বানিয়েছি (সুরা নিসা, ৪: ৩৩)।

এ আয়াতে মাওলা অর্থই হল আছাবা, যা হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কাতাদা রাহ. মুজাহিদ রাহ. ইবনে যায়েদ রাহ.-এর কৃত তাফসির ও মহানবি সা.-এর হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়। আর মেয়েরা আছাবা হলে তারা সমস্ত সম্পদই পাবে।

৩. পুরুষ আছাবাগণ কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে আছাবা বলে পরিগণিত নন। তখন তারা হয়ত যবীল ফুরূজ হবেন অথবা বঞ্চিত থাকবেন। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

আর মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে মৃত ব্যক্তি যা কিছু রেখে যাবেন তাতে এক ষষ্ঠাংশ করে পাবেন যদি তার কোনো সন্তান থাকে (সুরা নিসা, ৪: ১১)।

এ আয়াতের মাধ্যমে জানা গেল যে, কন্যা সন্তান থাকলে পিতার মতো সর্বাধিক শক্তিশালী আছাবাও 'যবীল ফুরূজ' বলে পরিগণিত হবেন এবং এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারিত হিস্সা লাভ করবেন। তখন তিনি আছাবা হিসেবে পরিগণিত হয়ে এক ষষ্ঠাংশের অতিরিক্ত পাবেন না। পিতার পরে দ্বিতীয় শক্তিশালী আছাবা হলেন ভাই। কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে সে ভাই কোনো হিস্সাই পাবেন না। কারণ আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেন:

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

আর ভাই বোনের মৃত্যুতে উত্তরাধিকারী হবে, তবে শর্ত হল যদি সে মৃত বোনের কোনো সন্তান না থাকে (সুরা নিসা, ৪: ১৭৬)।

এ আয়াতে ভাইয়ের হিস্সা পাওয়ার জন্য মৃতকে নি:সন্তান হওয়ার শর্ত রাখা হয়েছে।

৪. সুরা নিসার ১৭৬ নম্বর আয়াতটি ইলমুল ফারাইজ সংক্রান্ত সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হওয়ার কারণে এ আয়াতের মাধ্যমে আগেকার সকল হুকুমের ওপরে এ আয়াতের বিধান প্রাধান্য পেয়েছে। হজরত সা'দ বিন রাবীয়' রা. সংক্রান্ত হাদিসসহ কিছু হাদিসে কন্যাদেরকে নির্ধারিত হিস্সা দিয়ে বাকি সম্পদ ভাইদেরকে রসুল সা. দিয়েছেন বলে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সর্বশেষ নাযিলকৃত এ আয়াতের মাধ্যমে উহার কার্যকারিতা রহিত হয়ে গিয়েছে। কারণ হজরত বারা ইবন আযিব রা. বলেন:

اَخِرُ اٰيَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْ الْكَلاَلَةِ

সর্বশেষ কুরআনের যে আয়াত নাযিল হয় তা হল- يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْ الْكَلاَلَةِ - অর্থাৎ সুরা নিসার এই ১৭৬ নম্বর আয়াত।[৪৪]

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা কন্যাদেরকে প্রথমে শুধু হিস্সাদার ঘোষণা করেন, অনেক পরে ঘোষণা করেন যে, পুরুষ নারী সবাইকে মাওলা বানিয়েছি। আর দশম হিজরি সনে বিদায় হজের প্রাক্কালে সন্তানদের উপস্থিতিতে ভাই-বোন পাবে না বলে নির্দেশনা দান করেন।

[৪৪] মুসলিম- ৪২৩৭, বাবু আখিরু আয়াতিন উনযিলাত; বুখারি- ৪৩৭৭, কিতাবুত তাফসির।

ইদারাতুস সালাত (إِدَارَةُ الصَّلَاة) লেখক: আহমদ বাস্‌সাম সাঈ, প্রকাশনা: দারুল ফিকর, দামেস্ক, প্রথম প্রকাশ: ১৪৩৬ হি./২০১৫ সাল, আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৯৩৩-১০-৮৮৬-১, মোট পৃষ্ঠা: ৩৯২।

রিভিউয়ার: ড. মো. আনোয়ারুল কবির, সহযোগী অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, E-mail: absardu@gmail.com

এটি সালাত বিষয়ে লিখিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে গ্রন্থকার মানব জীবনের সাথে সালাতের সম্পর্ক এবং সালাতের সাথে মানব জীবনের সম্পর্ক খুব কুশলতার সাথে তুলে ধরছেন। সালাত মানব জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। সালাতের প্রতিটি রোকনে, প্রতিটি শর্তে, তাসবিহ-তাহলিলে, তাকবিরে-তাহমিদে মিশে আছে মানব জীবন। গ্রন্থাকার বিষয়টিকে খুবই যৌক্তিকভাবে বাস্তবতার উপমা টেনে উপস্থাপন করেছেন।

প্রতিটি কর্ম ছোট হোক কিংবা বড়, ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক যদি তা পূর্ব ব্যবস্থাপনার আলোকে, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন করা হয় তবে সেটি একটি কাঙ্খিত ফলাফল বয়ে আনে, সফলতার মুখ দেখে। এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জ্ঞানের এক বিশাল শাখা 'ব্যবস্থাপনা'। বিজ্ঞ লেখক বুঝাতে চান, যদি পৃথিবীর প্রতিটি কাজ ব্যবস্থাপনার আলোকে সম্পাদিত হওয়ার প্রবণতা মানুষকে উৎসাহিত করে, তবে সালাতও সম্পাদিত হওয়া উচিত ব্যবস্থাপনার আলোকে। আর এখানেই গ্রন্থটির নামকরণের সার্থকতা।

নামকরণের এ কারণ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে লেখক তার গ্রন্থের সূচনা করেছেন। নিজ দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে জীবনের বিস্তৃত অঙ্গন থেকে বাস্তব উদাহরণ তুলে এনেছেন। লেখক বুঝাতে চান, সালাত কুলির মাথায় চাপিয়ে দেয়া কোনো বোঝা নয় যে, সেটি গন্তব্যে পৌঁছে মাথা থেকে নামালেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেলো। কিংবা সালাত তোতা পাখিকে শিখিয়ে দেয়া কোনো বুলি নয় যা সে আওড়িয়ে চললো। বরং সালাত হলো আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন হওয়ার মাধ্যম। আল্লাহর সাথে বান্দার মিলনের সেতু। বান্দার মিরাজ। এটি আদায় করলেই শেষ হয় না, এটিকে অনুধাবণ করতে হয়। আর এ জন্য প্রয়োজন পূর্ব ব্যবস্থাপনা।

লেখক একবার বক্তৃতার মঞ্চে দাড়িয়ে সংবাদ পাঠের মতো কিছু আওড়িয়ে নেমে গেলেন। কাজের ব্যস্ততা দেখিয়ে। এতে শ্রোতারা আশা হত হলো। বিরক্ত হলো। লেখকের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্তে এক ধরণের অবজ্ঞা তৈরি হলো। এর কিছু সময় পর লেখক আবার সে মঞ্চে উঠলেন। শ্রোতাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, একটু আগের আমার আচরণে আপনারা নিশ্চয় হতাশ হয়েছেন, বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু একটি বারও কি লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, একই কাজ আমরা প্রতিদিন পাঁচবার আমাদের প্রভুর সাথে করে চলছি। জায়নামাজে দাড়িয়ে রাব্বুল আলামিনের সাথে প্রেমের অভিসারে মিলিত হওয়ার পরিবর্তে নিজের কিছু কথা সংবাদ পাঠকের মতো বলে নিজের কাজের ব্যস্ততা দেখিয়ে চলে আসছি? এটাই কি সালাতের উদ্দেশ্য? এমন জীবন ঘনিষ্ঠ উদাহরণ আর উপমা দিয়ে লেখক সালাতের বাস্তবতা ও এর আধ্যাত্মিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সালাতকে আমরা মনে করি, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর অবশ্যকরণীয় একটি দায়িত্ব। ফরজ। কিন্তু আসলেই কি সালাত কেবল আমাদের ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব? এ দায়িত্ব বোধ থেকেই কি আমরা সালাত আদায় করছি? এর বাইরে কি সালাতের অন্যকোনো আবেদন নেই? এমন প্রশ্নের জবাবে লেখক খুবই শক্তিশালী দলিল ও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন, সালাত কোনো বিরস দায়িত্ব নয়; বরং সালাত হলো এমন উপভোগ্য বিষয় যা অর্জন করার মধ্যে মানব জীবনের সার্থকতা লুকায়িত। কিন্তু অধিকাংশের কাছেই এর মজা ও স্বাদের বিষয়টি অস্পষ্ট। আর এ

দায়িত্ববোধ ও মজা উপভোগ এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে 'তাতো কঠিন তবে খাশেয়ীনদের জন্য নয়" আল্লাহর এ চিরন্তন বাণীর রহস্য।

সালাতের প্রকৃত হাকিকত বা বাস্তবতা বর্ণনার এটি একটি চমৎকার গ্রন্থ। বলা ভালো এ বিষয়ে অনন্য এক কিতাব। সালাতের হাকিকত বা বাস্তবতা, এর মারেফাত বা গুরু রহস্য উদঘাটনে অনেকেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু আহমাদ বাস্সাম সাঈ যে আঙ্গিকে, যে আদলে, যে ভঙ্গিমায় সালাতের হাকিকতের সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়েছেন, তা অসাধরণ। সত্যিকার অর্থে একজন পাঠক অনুধাবন করবেন যে, সালাত আসলে আদায়ের বিষয় নয়; বরং উপভোগ করার বিষয়। আর এ বোধ যখন জাগ্রত হয় তখন সালাত আর কষ্টকর থাকে না। সেটি পরম কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। যা পাওয়ার জন্য সে উদগ্রীব থাকে।

সালাতের আয়োজন শুরু হয় আজান থেকে। এর পরিসমাপ্তি ঘটে সালাম, তার পর দোয়া-ইস্তিগফারের মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞ লেখক পাঠককে নিয়ে যেতে চান সালাতের ভেতরে। গভীর থেকে গভীরে। সালাত নামক এ প্রেম অভিসারের গভীর সমুদ্রে ডুবিয়ে পাঠকের দৃষ্টিতে এনে দিতে চান এর ভেতরে লুকিয়ে থাকা সকল মনি-মুক্তা। সত্যিকার অর্থেই একজন পাঠক খুঁজে পাবেন এর খাজানা। এখানেই লেখকের সার্থকতা। আজানের প্রথম ধ্বনি আল্লাহু আকবারের সাথে সাথে পাঠককে নিয়ে লেখক ডুব দিতে চান এ দরিয়ায়। তাকে দেখাতে চান আশ্চর্য সব রহস্য। আস্বাদন করাতে চান খোদা প্রেমের শারাবান তহুরার অমিয় সুধা।

জীবন ও জীবন ঘনিষ্ট সব উপমা দিয়ে, আমাদের আশেপাশে পরে থাকা উদাহরণ দিয়ে, পাঠকের সামনে সালাতকে এক নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। সালাতের সাথে তো পাঠকের পরিচয় রয়েছে, কিন্তু লেখক সালাতের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন, যে দৃষ্টিকোণ থেকে সালাতকে বিবেচনা করেছেন, তা পাঠকের কাছে নতুন, বিস্ময়কর। অনেক পাঠকই বিষয়টিকে সেভাবে কখনো ভেবে দেখেন নি। যেমন: ধরাপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে আমাদের মাথার ওপর ভাসমান মেঘ খণ্ডকে প্রতি নিয়তই আমরা দেখছি। কিন্তু হাজার ফুট উপরে উঠে, মেঘের ওপর আরোহণ করে মেঘ দেখা আর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মেঘ দেখা কখনই এক নয়। এক হতে পারে না। এতে অবশ্যই তফাৎ রয়েছে। তফাৎটি তার চোখেই ধরা পড়ে যিনি উভয়ভাবে মেঘ দেখার সুযোগ লাভ করেছেন। ঠিক তেমনি লেখক পাঠককে সালাতের ভেতরে ঢুকিয়ে সালাতকে দেখাতে চেয়েছেন। সালাতকে তুলে ধরেছেন সম্পূর্ণ নতুনভাবে, অভিনব কৌশলে, চিত্তাকর্ষক আঙ্গিকে, হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে, প্রাঞ্জল ভাষায়, যাদু মাখা বর্ণনায়, অনন্য এক দোলায়। আর এ ক্ষেত্রে তার কলম বেশ বলিষ্ঠ, সাবলীল।

সালাতের এ তাত্ত্বিক বাস্তবতা প্রমাণ করতে গিয়ে লেখক কুরআন হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন বেশ চোখে পড়ার মতো করে। তবে এ ক্ষেত্রে লেখকের বৈশিষ্ট্য অনুপম। নিজের চিন্তা বা মতকে, যুক্তি বা দর্শনকে প্রমাণ করতে তিনি কুরআন হাদিসের উদ্ধৃতি পেশ করেন নি; বরং কুরআন হাদিসের বর্ণনা থেকে বের করে এনেছেন তার বক্তব্য। আর এ বক্তব্য বুঝাতে গিয়ে পেশ করেছেন বাস্তব জীবনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জীবনমুখি সব উদাহরণ। তবে তার বর্ণনার ভঙ্গিমা অনন্য। প্রথমে তিনি উদাহরণ পেশ করে পাঠকের মনযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন। উদাহরণটি যেহেতু পাঠকের চেনা পরিচিত তাই তা সহজে পাঠকের চিন্তায়, কল্পনায় বাস্তব রূপ লাভ করে। সে বাস্তবতার পথ ধরেই পাঠককে নিয়ে যান সালাতে। আর সেখানে পরিচয় করিয়ে দেন আল্লাহর কালামের সাথে কিংবা নবিজীর হাদিসের সাথে।

প্রথাগত সাধারণ লেখকের বলয় থেকে বেরিয়ে গ্রন্থকার নতুন ও চমৎকার এক বর্ণনা ভঙ্গির অবতারণা করেছেন। অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ জাতিয় শব্দের ব্যবহার বর্জন করেছেন। বরং এখানেও লেখক পাঠককে মসজিদের গুম্বজের নিচে

মিম্বারের সামনে হালকায় বসিয়েছেন। এর মাধ্যমে লেখক পাঠকে চৌদ্দশত বছর আগে মসজিদে নববীর চত্তরে নবিজীর মজলিসে সাহাবায়ে কেরামের কাতারে শামিল করার প্রয়াস পেয়েছেন। আর তাই অধ্যয়-এর পরিবর্তে 'কুব্বা' অর্থাৎ গুম্বজ শব্দ এবং পরিচ্ছদ-এর পরিবর্তে 'মিম্বার' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। অনুচ্ছেদ-এর পরিবর্তে 'হালকা' শব্দটি এক প্রাণবন্ততা সৃষ্টি করেছে।

গ্রন্থটিতে যে বিষয়গুলি স্থান পেয়েছেন তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ

১. সালাত দায়িত্ব না উপভোগ্য বিষয়? কখন সেটি আদায় করা কষ্টকর আর কখন সেটি উপভোগ্য? কিভাবে তা বান্দা কষ্টকর অবস্থা থেকে উপভোগ্যের স্তরে উন্নীত হয়? সালাতের জন্য ধৈর্যের উপভোগ্যতা।

২. জীবন ও সালাত। কেন আমরা সালাত আদায় করি? সালাতের জন্য কেন আরামের বিছানা ছেড়ে, আরামের ঘুম ছেড়ে জাগ্রত হই? কিভাবে সালাত আমাদের জীবন সূচিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের জীবনের ওপর সালাত কি প্রভাব বিস্তার করে?

৩. সালাতের বিভিন্ন আঙ্গিক ও রূপ। সভ্যতার ক্রম বিকাশে সালাতের ভূমিকা কি? খোদাভীতির প্রহরদার। জীবনের চলমানতা আখেরাতের প্রস্তুতি। সালাতের মাঝে কেন মুসল্লির এ পরিবর্তন? অপরিমেয় কল্যাণ ও জীবনের পারঙ্গমতা।

৪. মহান সফরের প্রস্তুতি। আজান ও এর বিস্ময়। অযু ও মিসওয়াক। কেন এ মসজিদের আয়োজন? কেনই বা সালাতের ইন্তেজার?

৫. সালাতের ভেদ। জুমুআ ও জামাতের রহস্য। জামাতের সালাত: সভ্যতার গুপ্ত তথ্য। জুমুআর সালাত: আত্মা ও শরীরের পবিত্রতা। জুমুআর খুতবা: সাপ্তাহিক জীবনী শক্তি সিঞ্চন। এখান থেকেই আমাদের উর্ধ্বগমন।

৬. আল্লাহর দিকে মিরাজ। সালাতের পঞ্চ পথ। খুশুর বড় শত্রু ভালোবাসা। খুশু যাদুকরি শক্তির কেন্দ্র। অনুভূতি শক্তি থেকে বহিরাগমন। পবিত্র সফর।

৭. উর্ধ্বগমন ও নেতৃত্বের কাষ্ঠফলক। রহস্যের কুঞ্জি।

৮. সালাতের ভাষার রহস্য। কেরাত ও তেলাওয়াতের সম্পর্ক। কুরআনুল কারীমের নতুন ভাষা।

৯. ফাতেহা ও ক্বেরাতের ভেদ। ফাতেহা ও ক্বেরাতের ভূমিকা। বিসমিল্লাহর রহস্য।

১০. শেষ বৈঠকের রাজ। রুকু সেজদার কেন্দ্রবিন্দু। আত্তাহিয়্যাহ: রহস্য উন্মোচনের লাল চাবি। আত্তাহিয়্যাহ: সবুজ অঙ্গন। সালাম। শাহাদাতাইন। সালাতে ইবরাহিম।

১১. অর্জন। পৃথিবীতে প্রত্যাগমন। সালাত থেকে বের হওয়া। দোয়া ইস্তিগফারের জন্য ইন্তেজার করা। সালাতের প্রাপ্তি হিসেব।

১২. সম্মানের সিঁড়ি। সালাতের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি।

১৩. আমাদের জীবন হয়ে উঠুক সালাত। সালাতই হয়ে উঠুক আমাদের জীবনের চালিকা শক্তি।

সুপারিশ

বাংলা ভাষা এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থ থেকে বঞ্চিত। আমাদের জানা মতে বাংলায় এমন গ্রন্থ রচনা হয় নি। বাংলা ভাষার এ এক বিশাল শূণ্যতা। গ্রন্থটি অনুবাদ হলে আশা করা যায় এ শূণ্যতার বিশাল একটি অংশ পূর্ণ হবে। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের প্রভুত কল্যাণ সাধন হবে। বাংলার মুসলমানদের কাছে সালাতের হাকিকত থেকে পর্দা সরে যাবে। তাই গ্রন্থটির বাংলায় অনুবাদের ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করছি।

ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, লেখক: ইউসুফ আল-কারযাভী, অনুবাদ: মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রকাশক: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি), প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৫, আইএসবিএন: 978-984-8471-38-8, মোট পৃষ্ঠা: ২৮০।

রিভিউয়ার: নূরুল হুদা, খতিব, হজরত উসমান রা. জামে মসজিদ, কক্সবাজার, E-mail: uniqueprise1985@gmail.com

এটি "ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা" বিষয়ের ওপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অসাধারণ একটি গ্রন্থ। এতে ইসলামে রাষ্ট্রের গুরুত্ব, মর্যাদা ও পরিচালনা পদ্ধতি এবং এ সংশ্লিষ্ট আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও যৌক্তিক আলোচনা-সমালোচনা, পর্যালোচনা এবং কুরআন সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে ইসলামি রাষ্ট্র সংক্রান্ত অনেক প্রশ্ন, অভিযোগ ও সন্দেহ তথা ভুল বুঝাবুঝির বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা, পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে।

যারাই ইসলাম ও ইসলামি রাজনৈতিক বিষয়ে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য গ্রন্থটি দারুণ এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। গ্রন্থটি ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থটির অধ্যায় ভিত্তিক প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

প্রথম অধ্যায়ে ইসলামে রাষ্ট্রের গুরুত্ব ও মর্যাদা, কুরআন-সুন্নাহ্‌র অসংখ্য অকাট্য আদেশ-নির্দেশ, রসুল সা. ও সাহাবাদের বাস্তব জীবনাদর্শ, শতাব্দির পর শতাব্দিব্যাপী ইসলামের বাস্তব ও স্বীকৃত ইতিহাস, ইসলামের প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য থেকে অসংখ্য দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করার সাথে সাথে ইসলামি বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি প্রাচ্য বুদ্ধিজীবিদের বক্তব্যও তুলে ধরা হয়েছে।

যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিম বিশ্বকে শাসন ও শোষণ করেছিল তারা মুসলমানদের মন মস্তিষ্কে এক ঘৃণ্য ও ধংসাত্মক চিন্তা চেতনা ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল, যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে: ইসলাম কতিপয় বিধি-বিধান সম্বলিত একটি ধর্ম মাত্র, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাষ্ট্রের বিধি-বিধানের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সাম্রাজ্যবাদ খ্রিষ্ট ধর্মকে পাশ্চাত্যে যেভাবে গৃহীত হয়েছে ইসলামকে প্রাচ্য সে রূপে দেখতে চায়। পাশ্চাত্যে যেমনিভাবে ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পুনর্জাগরণ সম্ভব হয়েছে বলে তারা মনে করে, তেমনিভাবে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে তারা ধর্মের অনুশাসন থেকে মুক্ত করা আবশ্যক মনে করে। পাশ্চাত্যে ধর্মের রূপ হচ্ছে: গীর্জা, মহান পোপের দাপট, মানুষের জান-মাল ও বিবেক-বুদ্ধির ওপর তথা পুরোহিতদের স্বেচ্ছাচারিতা, জুলুম, অত্যাচার ইত্যাদি।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলাম যেমনিভাবে সৎ ব্যক্তি, সুন্দর পরিবার ও সুশীল সমাজ গড়তে চেষ্টা করে তেমনিভাবে উপযুক্ত, সুন্দর ও মহৎ রাষ্ট্র গঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও ইসলামে অলংঘনীয় একটি বিধান।

রাজনীতি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজনীতি ব্যতিত ইসলামের সত্যিকার ও প্রকৃতরূপের (যেভাবে আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন) পরিপূর্ণতা লাভ অসম্ভব। ইসলামকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তা আর ইসলাম থাকে না। অন্য কোনো আচার সর্বস্ব ধর্মে পরিণত হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে লেখক উপস্থাপন করেন যে, ইসলামি রাষ্ট্র হচ্ছে ইসলামি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি সিভিল রাষ্ট্র। এটি কোনো ধর্মীয় কিংবা সর্ববাদী ও স্বৈরাচারি রাষ্ট্র নয়– যা মানুষের কাঁধে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে এবং খোদায়ী অধিকারের নামে মানুষের কণ্ঠ ও বিবেক-বুদ্ধি স্তব্ধ করে দেয়। এটি পাশ্চাত্যের কোনো পুরোহিত বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের রাষ্ট্র নয় যারা মনে করে যে, তারাই পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হয়ে তার ইচ্ছা মোতাবেক কাজ করে এবং তাদের ফায়সালাই আসমানী ফায়সালা। তারা যা মিমাংসা ও সমাধান দেয় তাই আসমান থেকে আগত সমাধান এবং তারা যা বিশ্বাস করে তাই আসমানী আকিদা/বিশ্বাস। এসকল ধারণার সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি প্রমাণ করেন যে, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন মানবতাবাদী রাষ্ট্র। ইসলাম সাংবিধানিক আইনানুগ ও পরামর্শ ভিত্তিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র। ইসলামি রাষ্ট্র অসহায় দুর্বলদের আশ্রয় স্থল এবং মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের রাষ্ট্র। তাছাড়া ইসলামি রাষ্ট্র চারিত্রিক ও আদর্শিক রাষ্ট্র। উপরোক্ত বক্তব্যগুলো লেখক এ অধ্যায়ে অনেকগুলো শিরোনামের অধীন অত্যন্ত সুন্দর যুক্তিপ্রমাণসহ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক ইসলামি রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করেছেন। তিনি বলেন যে, ইসলামে তথাকথিত ধর্মীয় রাষ্ট্র কিংবা সেক্যুলারিজমের কোনো স্থান নেই। যারা ইসলামি রাষ্ট্রকে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় রাষ্ট্র বলে ধারণা করে তাদের অনেক সন্দেহ, অভিযোগ ও প্রশ্নের যৌক্তিক জবাব তারা এখানে পাবেন।

আল্লাহর হাকীমিয়্যাত তথা 'আল্লাহর শাসন-কর্তৃত্ব' দর্শন বিষয়ে ইমাম সাইয়েদ আবুল আলা, ইমাম গাজ্জালী ও শহীদ সাইয়েদ কুতুবের বক্তব্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে লেখক এর প্রকৃত স্বরূপ এখানে তুলে ধরেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তা ধারা ও বিধি-বিধান বিষয়ে ইসলাম পক্ষ ও ইসলাম বিপক্ষ– উভয় পক্ষ থেকে যেসব ভুল-ভ্রান্তিমূলক চিন্তা ও বক্তব্য রয়েছে তার কতিপয় বিষয়ের সংশোধন কল্পে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে 'আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা' এই শিরোনামের অধীনে লেখক এ বিষয়টির বিভিন্ন দিক ও প্রশ্নের ওপর তথ্যভিত্তিক প্রয়োজনীয় আলোচনার অবতারণা করেছেন। এ অধ্যায়ে 'অসৎ কাজের প্রতিরোধের স্তর বিন্যাস এবং এক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের বৈধতা' শিরোনামে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক আলোচনা স্থান পেয়েছে যা প্রত্যেক শিক্ষিত ও সুশীল সমাজের অধ্যয়ন করা উচিৎ বলে মনে করি।

পঞ্চম অধ্যায়ে লেখক গণতন্ত্র, বহুদলীয় রাজনীতি, পার্লামেন্টে অমুসলিমদের মনোনয়ন প্রদান, অনৈসলামিক সরকারের সাথে কোয়ালিশন, নারীর রাজনৈতিক অধিকার, পার্লামেন্ট নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ, জালিম স্বেচ্ছাচারি শাসকের অনুগত জাতির প্রতি কুরআনের নিন্দাবাদ, জালেম শাসক গোষ্ঠীর সেনাবাহিনী ও শাসন যন্ত্রও তার পাপাচারের দায়-দায়িত্ব বহন করবে, জাতির শাসন এবং আল্লাহর শাসন, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

মূলনীতির উদ্দেশ্য, সংখ্যা গরিষ্ঠতার শাসন কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক? সুপ্রতিষ্ঠিত ও শ্বাশত বিষয়াবলীতে নির্বাচন বা মতামত প্রদান, অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যতা নির্ভরযোগ্য একটি কারণ ইত্যাদি আরো অনেক বিষয়ের কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামি 'মাক্বাসিদ' তথা ইসলামের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অপুর্ব সুন্দর আলোচনা করেছেন। অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, গণতন্ত্রের মূল কথা এবং ইসলামের মূলনীতির সাথে কোনো বৈপরিত্য নেই। মানুষ অপছন্দ করে কিংবা তাদের মনঃপুত নয় এমন ব্যক্তির ইমামতিকেও ইসলাম সমর্থন করে না। হাদিসে এসেছে- তিন ব্যক্তির নামাজ তাদের মাথার এক বিঘত ওপরেও পৌঁছেনা। তাদের প্রথম জন হচ্ছে- এমন ব্যক্তির নামাজ যে এমন সকল মানুষের ইমামতি করছে যারা তার ইমামতিতে সন্তুষ্ট নয়। নামাজের ইমামতির ব্যাপারে যেমন এটা ঠিক তেমনি জগত, সংসার ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

বহুদলীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা যায়, ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকতে শরিয়াতের পক্ষ থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং বহুদলীয় রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা সবসময় ছিল, আছে এবং থাকবে। কারণ এটি জাতির ঘাড়ে জগদ্দল পাথরের মতো অন্যায়ভাবে চেপে বসা স্বৈরাচারি শাসক গোষ্ঠীর জুলুম অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের অন্যতম একটি উপায়। শাসক গোষ্ঠীর কার্মকান্ডে 'না' কিংবা 'কেন' বলার মত যদি কোনো শক্তি বা দলের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে অনিয়ম ও জুলুম অত্যাচার সমাজ তথা রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থান করে নেবেই। আল্লাহ তায়ালা সুরা আলাক্বের ৬ এবং ৭ নম্বর আয়াতে এ বিষয়টির দিকেই এই বলে ইঙ্গিত দেন।

كلا ان الانسان ليطغى- أن راه استغنى

(কোনো কোনো) মানুষ যখন নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, অভাবমুক্ত, কৈফিয়ত মুক্ত দেখে তখন সে সীমালঙ্ঘন- বাড়াবাড়ি করেই ছাড়ে (সুরা আল আলাক, ৯৬: ৬-৭)।

সুদূর ও অদূর ইতিহাস বা অতীত ও বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি অবলোকন করলে উক্ত আয়াতের সত্যতাই প্রমাণিত হবে। এ অধ্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ওপর যে অসাধারণ আলোচনা লেখক করেছেন এবং এক্ষেত্রে উপস্থাপিত অনেক সন্দেহ ও সংশয় মিশ্রিত প্রশ্নের কুরআন-হাদিস নির্ভর ও বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দিয়েছেন, তা পড়ে যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রই চমৎকৃত ও পুলকিত না হয়ে পারবেন না।

এখানে পরিসরের স্বল্পতার কারণে কোনো বিষয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা সম্ভব হয় নি। গ্রন্থটির দু'একটি বিষয়ের প্রতি শুধু ইঙ্গিত প্রদান করা সম্ভব হয়েছে মাত্র। গ্রন্থটি বর্তমান বিশ্বের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মুজতাহীদ আলেম হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত এক মহান মনীষী কর্তৃক লিখিত। মূল আরবি গ্রন্থটি আরব বিশ্বের সর্বমহলে যেমন সমাদৃত হয়েছে তেমনি আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা ভাষি শিক্ষিত ও সমাজ-রাষ্ট্র সচেতন মানুষের কাছেও একই ভাবে সমাদৃত ও পঠিত হবে বলে আশা করা যায়।